ইমন কল্যাণ

নিমাই ভট্টাচার্য

॥ বিশ্ববাণী প্রকাশনী : কলকাতা-৯ ॥

প্রথম প্রকাশ :
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৮

প্রকাশক :
শ্রীব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

শরৎ পূর্ণিমায় প্রেয়সীকে পাশে নিয়ে মোহাবিষ্ট হয়ে তাজের শোভা দেখার জন্য নয়, দেশ-বিদেশের ভি-আই-পি'দের তাজ দর্শনের খবর টাইপরাইটারে খটখট করে, আমার সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দেবার জন্যই বার বার আগ্রা গেছি। তাজ দেখেছি। দেখতেই হয়েছে।

আগ্রায় গেলেই আমি ঐ হোটেলে উঠেছি। বরাবর। সব সময়। সেবার রিসেপশন কাউন্টারের সামনে হাজির হতেই অঞ্জলি একটু রাগ করেই বলল, আপনাকে এ হোটেলে থাকতে হবে না।

কারণটা আমার অজানা ছিল না। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

ভুরু কুঁচকে অঞ্জলি বললো, আপনি টাইপরাইটার না নিয়ে আসতে পারেন না?

আমি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, টাইপরাইটার নিয়ে এসেছি বলেই কি আপনাদের হোটেলে থাকতে দেবেন না?

কারণটা যখন জানেন তখন আবার প্রশ্ন করছেন কেন?

অঞ্জলির সহকর্মী গৌতম ভরদ্বাজ আমাদের কথাবার্তা শুনে হাসছিল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিহে, আমাকে তোমাদের হোটেলে থাকতে দেবে না?

গৌতম কোনমতে হাসি চেপে বললো, আমরা কলিগদের কাজে ইণ্টারফেয়ার করি না।

কিন্তু আমার মত একজন পার্মানেণ্ট প্যাসেঞ্জারকে রিসেপশন কাউণ্টার থেকে এভাবে ফিরিয়ে দেওয়া কি ঠিক?

গৌতম কিছু বলার আগেই অঞ্জলি বলল, আপনার মত একজন প্যাসেঞ্জার হারালে আমাদের হোটেলের কিছু ক্ষতি হবে না।

গৌতম ভরদ্বাজ কাউন্টারের ওপাশে যেতেই আমি একটু চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, আমি এখানে না থাকলে হোটেলের কিছু ক্ষতি হবে না ঠিকই কিন্তু তোমার?

অঞ্জলি এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বললো, আমার আবার কী হবে?

কোন দুঃখ? কোন ক্ষতি?

তুমি কী আমার জন্য এসেছ যে এখানে না থাকলে আমি দুঃখ পাব?

শুধু কাজের জন্য আসিনি।

একটু বা[illegible] জন্য এসেছি।

শুধু কাজের জন্য এলে অন্য হোটেলেও তো থাকতে পারতাম।

ওপাশের বার থেকে হয়ত তাই উঠবে।

এই সাত-সকালে রিসেপশন কাউন্টারে কোন ভিড় ছিল না বলে নাটক জমেছিল। আমি একটু হেসে অঞ্জলিকে বললাম, ইওর ম্যাজেস্টি! এক কাপ চা খাওয়াবার পর তাড়িয়ে দিলে ভাল হত না?

[illegible] মত অঞ্জলি চায়ের অর্ডার দিল। চা এলো। চা খেতে খেতেই হার ম্যাজেস্টির হুকুম শুনলাম, রোমান্টিক ফোর-জিরো-সিক্সে এবার থাকা হবে না। ফোর-ওয়ান-ফাইভে দিচ্ছি।

আমি প্রায় কুর্নিশ করে বললাম, ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাড়া! দয়া করে যা দিয়েছেন, তাতেই বান্দা কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ।

ঘরে পৌঁছবার দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই টেলিফোন।

হ্যালো।

কোন ভূমিকা না করেই অঞ্জলি বললো, এর পর টাইপরাইটার নিয়ে এলে সত্যি তোমাকে ঘর দেব না।

দেবে না?

না।

আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে?

কত রথী-মহারথীকে ফিরিয়ে দিচ্ছি আর তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না?

সম্রাট শাজাহানকে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা তোমার আছে কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা তোমার নেই।

কেন?

আমি আগ্রায় এসে অন্য কোথাও আছি, এ তুমি সহ্য করতে পারবে না।

হ্যাঁ আছে। [illegible] তাবার জন্য [illegible] থেকে পালাচ্ছি [illegible]...

শাজাহানকে ফিরিয়ে দেবার জন্য তোমাকে এ দুঃখ দিতে পারব না।

তুমি আমার কাছে মার খাবে।

কেন?

তোমার কথাবার্তা শুনলে মনে হবে আমাকে ছাড়া পৃথিবীর আর কোন মেয়েকে চোখেও দেখনি।

চোখ দিয়ে অনেককেই দেখেছি কিন্তু মন দিয়ে শুধু তোমাকেই...

থাক, থাক! আমাকে ভোলাতে হবে না। ইনিয়ে-বিনিয়ে মিথ্যা কথা বলতে তোমার জুড়ি নেই।

[illegible] হাত [illegible] পারি...

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললো, কে তোমাকে বুকে হাত দিতে দি[illegible]

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন কেটে যায়।

আমি ঘরে বসে পর পর দু' তিনটে সিগারেট খাই। কখনও কখনও সিগারেট খেতে খেতে লম্বা বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখি। একটু হাসি। গুনগুন করে গান গাই।

আবার টেলিফোন বেজে ওঠে।

কী করছ? স্নান হয়ে গেছে?

না।

এতক্ষণ কী করছিলে?

তোমার কথা ভাবছিলাম।

আবার মিথ্যে কথা বলছ?

তোমার হৃদয়ে হাত দিয়ে বলতে পারি ··

আবার অসভ্যতা করছ?

এটা অসভ্যতা হলো?

তবে কী খুব সভ্যতা হলো?

তোমার সঙ্গে এটুকু ঠাট্টা করার অধিকার আমার নেই?

আমার উপর তোমার কি কি অধিকার আছে শুনি।

শুধু শুনবে?

আবার কী করব?

অধিকারগুলো প্রয়োগ করতে দেবে না?

ব্যস। টেলিফোন কেটে গেল।

এবার আর দেরি না করে বাথরুমে যাই। বেরিয়ে আসি। রুম সার্ভিসকে ব্রেকফাস্ট দিতে বলি। ব্রেকফাস্ট আসে। কফি খেতে খেতে সিগারেট ধরাই।

মনে হয়, একবার রিসেপশনে ফোন করে অঞ্জুর সঙ্গে কথা বলি কিন্তু না, আমি টেলিফোন করি না। কাউন্টার থেকে ও আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। কাজের ফাঁকে এদিক-ওদিক থেকে অঞ্জুই আমাকে ফোন করে।

তুমি কী তৈরী?

হ্যাঁ।

এখুনি বেরুবে?

একটু পরে।

কখন ফিরবে ?

ঘণ্টাখানেক পর।

তারপর হোটেলেই থাকবে ?

না ; বাইরে খেতে যাব।

কেন ? হোটেলে খাবে না ?

না। হোটেলের খাবার আর ভাল লাগে না।

ডক্টর ব্যানার্জীর বাড়িতে থাক না কেন ?

থাকতে পারি না ওর মেয়ের জন্য।

কেন, ওর মেয়ে আবার কী করল ?

ও বাড়িতে থাকলে ওর মেয়ে এত বিরক্ত করবে যে···

বিরক্ত মানে ?

হয়ত মাঝ রাত্রে আমার কাছে এসেই হাজির হবে।

অঞ্জলি হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করে, মেয়েটা বুঝি অত্যন্ত বদ ?

বদ মানে আমার প্রতি ওর অত্যন্ত বেশী দুর্বলতা।

মেয়েটির প্রতি তোমার কোন দুর্বলতা নেই ত ?

বিন্দুমাত্র না।

যাক শুনে সুখী হলাম।

এইরকম হাসিঠাট্টা চলার পর হঠাৎ ও প্রশ্ন করে, এবার আসল কথা বলো। তুমি কি কাজ ছাড়া এখানে দু'এক দিনের জন্যও আসতে পার না ?

আমি একটু হাসি। বলি, অঞ্জু, বিশ্বাস কর, মনে করি প্রত্যেক রবিবার এখানে চলে আসব কিন্তু···

প্রত্যেক বার ঐ এক কথা আমাকে বলবে না।

প্রত্যেক বার আমি এই কথা বলি ?

প্রত্যেক বার।

আচ্ছা, এবার কথা দিচ্ছি পার্লামেন্টের বাজেট সেশন শেষ হলেই…

বাজেট সেশন কবে শেষ হবে?

মে মাসে।

তোমাকে আসতে হবে না।

কেন? ততদিনে কি তুমি আর তোমার স্বামী পেরাম্বুলেটর নিয়ে…

টেলিফোন কেটে গেল।

আইসেনহাওয়ার, ক্রুশ্চেভ-বুলগানিন, কুইন এলিজাবেথ, নাসের, টিটো ও আরো আরো কতজনের সঙ্গে বার বার আগ্রা গেছি। তাজ দেখেছি। ঘুরেছি আগ্রা ফোর্ট। ঘনিষ্ঠতা হয়েছে আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের ডক্টর ব্যানার্জীর সঙ্গে।

আগ্রা ফোর্ট ঘুরতে ঘুরতে ডক্টর ব্যানার্জী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আজই দিল্লী ফিরবে?

না দাদা, আমি আজ ফিরছি না।

তাহলে সন্ধ্যের পর আমার বাড়িতে এসো। একটু গল্পগুজব করে একেবারে ডাল-ভাত খেয়ে যেও।

আমি আপত্তি করলাম না। আপত্তি করার কোন অবকাশও ছিল না। শুধু বললাম, আমি তো আপনার বাড়ি চিনি না।

আরে আমার মেয়ে তো তোমাদের হোটেলেরই রিসেপশনে আছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। অঞ্জুই তোমাকে নিয়ে আসবে।

অঞ্জু?

অঞ্জু মানে অঞ্জলি। তোমার সঙ্গে আলাপ হয় নি?

মাথা নেড়ে বললাম, না।

হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে পাঁচ-ছ'টি মেয়ে আর পাঁচ-ছ'টি ছেলে কাজ করে। সব মেয়েরাই যুবতী ও সুন্দরী। সবাই একই ধরনের শাড়ি পরে। ওদের মধ্যে কে অঞ্জলি, তা ভেবে পেলাম না।

ডক্টর ব্যানার্জী বললেন, তুমি সাতটা-সাড়ে সাতটার পর ঘরে থেকো। ও তোমাকে নিয়ে আসবে।

সাতটা বাজতে না বাজতেই আমার ঘরে 'বাজার' বাজল। দরজা খুলতেই রিসেপশনের একটি মেয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করে বলল, আমি অঞ্জলি ব্যানার্জী।

আমি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললাম, আসুন, আসুন। সোফা দেখিয়ে বললাম, বসুন।

উনি বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলেন, একটু তাড়াতাড়ি চলে এলাম নাকি?

এলেই বা ক্ষতি কি?

না ক্ষতি কিছু নেই তবে আপনি হয়তো তৈরী হবেন···

অত দ্বিধা করার কোন কারণ নেই। চা খাবেন?

আপনি কি এখন চা খাবেন?

আমি সব সময় চা খাই।

চা খেতে খেতে কথা হচ্ছিল।

বললাম, এতদিন ধরে আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ কিন্তু আজই প্রথম জানলাম আপনি এখানে কাজ করেন।

আপনি আগে জানতেন না?

না।

আমি অবশ্য খুব বেশিদিন এখানে কাজ করছি না। জাস্ট এক এক বছর হলো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

এর আগে কোথায় কাজ করতেন?

অঞ্জলি হেসে বললো, এই আমার প্রথম চাকরি।

এর আগে কি পড়াশুনা করছিলেন?

পড়াশুনা শেষ করে বসেছিলাম।

আপনি কি এখানেই পড়াশুনা করেছেন?

বি. এ. পড়েছি দিল্লীতে। এম. এ. পড়েছি এখানকার ইউনিভার্সিটিতে।

কি নিয়ে এম. এ. পড়েছেন?

কি আবার! বাবার প্রিয় সাবজেক্ট হিস্ট্রী নিয়ে।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করি, আপনার প্রিয় সাবজেক্ট কি?

লিটারেচার। অঞ্জলি একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, একবার ভেবেছিলাম জার্নালিজম পড়ব।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, পড়লেন না কেন?

মেয়েদের ক'টা ইচ্ছা পূর্ণ হয়?

আপনার মত আধুনিক মেয়েদের ইচ্ছাও পূর্ণ হয় না?

হাজার হোক এটা ভারতবর্ষ।

তা ঠিক, কিন্তু মেয়েরা কি কম এগিয়েছে? শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়ে আপনি যে হোটেলে চাকরি করছেন, এটাও কি···

নেহাত বাবা আগ্রায় পোস্টেড ও এই হোটেলের অনেকের সঙ্গেই বাবার অত্যন্ত হৃদ্যতা আছে বলেই চাকরি করছি।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, এ চাকরি কেমন লাগছে?

খুব ভাল লাগছে বলব না তবে ইন্টারেস্টিং।

অঞ্জলির সঙ্গে এইভাবেই আমার আলাপ, পরিচয়। তারপর

থেকে আগ্রা গেলেই অঞ্জলি আমার সম্পর্কে একটু বেশি খেয়াল রাখত। মাঝে মাঝেই টেলিফোন করে আমার খবর নিত।

- ঘুম ভেঙেছে?

আমি জানতাম আপনি ঘুম ভাঙিয়ে দেবেন। তাই জেগে জেগে শুয়েছিলাম।

অঞ্জলি হেসে বলে, রুম সার্ভিসকে চা পাঠিয়ে দিতে বলব?

আমি একলা একলা চা খাব?

এখন আর কে আপনার সঙ্গে চা খাবে?

কেন আপনি?

আপনি জানেন না আমাদের ঘরে যাওয়া মানা?

জানি কিন্তু তবু তো দু-একদিন আমার ঘরে পদার্পণ করেছেন।

নেহাত এখানকার সবাই বাবাকে চেনেন ও আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তাই দু একবার আইন অমান্য করেছি।

আমার জন্য না হয় একটু আইন অমান্য করলেনই।

আইন অমান্য করা বড় বদ অভ্যাস।

কেন?

আইন অমান্য করতে শুরু করলে হয়তো আরো কত আইন অমান্য করার প্রবৃত্তি এসে যাবে।

নিজের উপর এইটুকু আস্থা নেই?

তা আছে বৈকি।

তাহলে চলে আসুন।

আচ্ছা আসব কিন্তু একটু পরে।

সো কাইণ্ড অফ ইউ।

আপনার চা পাঠিয়ে দিই?

দিন।

রিসেপশন কাউন্টারের সামনে যেতেই অঞ্জলি বললো, পোর্টার ঐ স্যুটকেস আর টাইপরাইটার'র নিয়ে ঢুকতেই বুঝতে পেরেছি, আপনি এসেছেন।

আপনি কী আমার স্যুটকেস আর টাইপরাইটারটাকেও চিনতে পারেন ?

রিসেপশনে কাজ করতে করতে এমনই অভ্যেস হয়ে গেছে যে পোর্টাররা লগেজ নিয়ে ঢুকলেই ওদিকে একবার চোখ পড়বেই।

তা না হয় হলো। কিন্তু আমার লগেজও কি আপনার…

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললো। এমন ছোট্ট স্যুটকেস আর লেদার বাউণ্ড টাইপরাইটার নিয়ে শুধু সাংবাদিকরাই আমাদের এখানে আসেন।

অঞ্জলি কথা বলতে বলতেই রেজিস্টার এগিয়ে দেয়। আমি নাম লিখতে লিখতেই বলি। আপনার বাবা-মা ভাল আছেন ?

হ্যাঁ। দু' একদিন আগেই ওরা আপনার কথা বলছিলেন।

রেজিস্টারে নাম লেখার পর ঠিকানা লিখতে যেতেই ও বললো ওসব আমি লিখে দেব। আপনি শুধু সই করে দিন।

আমার ঠিকানা আপনার মনে আছে ?

আছে।

সই করতে করতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বাবা-মা আমার সম্পর্কে কী বলছিলেন ?

নিজের প্রশংসা না হয় নাই শুনলেন।

আমি ত ওদের কোন ক্ষতি করি নি, তাহলে ওরা কেন আমার প্রশংসা করলেন ?

আমি ওদের জিজ্ঞাসা করব।

কাউন্টারের ওপাশ থেকে মিস নীলিমা তেওয়ারী অঞ্জলির পাশে এসে আমাকে বললো, দাদা, আই ওয়াণ্ট টু বী এ জার্নালিস্ট।

আমি জবাব দেবার আগেই অঞ্জলি ওকে বললো, তোর মত মেয়ে জার্নালিস্ট হলে ত সে কাগজের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নীলিমা ভুরু কুচকে জিজ্ঞাসা করল, তার মানে?

তোকে নিয়ে সব জার্নালিস্টরা এমন হৈচৈ শুরু করে দেবে যে তাদের দ্বারা কাগজের কাজ করা হবে না।

এবার আমি অঞ্জলিকে বললাম, আপনার মত কুৎসিত মেয়ে জার্নালিস্ট হলে সে ভয় নেই; তাই না?

আমার কথায় ওরা দুজনেই হাসে।

আমি ঘরে এসে পৌঁছবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ডক্টর ব্যানার্জীর টেলিফোন এলো, অঞ্জু ফোন করে বললো, তুমি এসেছ। তাই ভাবলাম, এখুনি বলে রাখি রাত্রে আমাদের এখানেই খাবে।

আমি কি আপনাদের জমিদার, যে প্রত্যেকবার এলেই আমাকে আপ্যায়ন করতে হবে?

জমিদারদের কেউ ভয় করে; কেউ ঘেন্না করে; কিন্তু তুমি ত আমার ফ্যামিলীতে দারুণ পপুলার।

দারুণ পপুলার! বলেন কী?

হ্যাঁ ভাই, আগে শুধু আমিই তোমার প্রেমে পড়েছিলাম। এখন দেখছি, আমার স্ত্রী আর মেয়েও তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

আমি হাসতে হাসতে বলি, তাহলে ত আমাকে নিয়ে আপনি মহা সমস্যায় পড়েছেন।

নিঃসন্দেহে।

দুজনেই হোহো করে হেসে উঠলাম।

হাসি থামলে উনি বললেন, অঞ্জুর ডিউটি শেষ হলে ওর সঙ্গেই চলে এসো।

আসব।

অঞ্জলির সঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে যাব বলে ধুতি পাঞ্জাবি পরে নিচে নামতেই রিসেপশন কাউণ্টারের সবাই প্রায় একসঙ্গে বললো, দাদা, আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছে। অঞ্জলি কোন মন্তব্য করল না।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, আমাকে সব পোশাকেই দারুণ দেখায়।

গৌতম ভরদ্বাজ বললো, তা ঠিক।

হোটেলের বাইরে আসতেই অঞ্জলি বললো, সত্যি ধুতি-পাঞ্জাবিতে আপনাকে খুব ভাল লাগছে।

তাই নাকি ?

সত্যি বলছি।

কিন্তু দু' মিনিট আগে ওদের সামনে অমন চুপ করে রইলেন কেন ?

বেশী প্রশংসা শুনলে আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

তাহলে ত আপনাকে এতদিনে পাগলা গারদে চলে যেতে হতো ?

কেন ?

আগ্রার মত শহরের এত বড় হোটেলের রিসেপশনে কাজ করতে করতে কত মানুষ যে আপনার রূপের প্রশংসা করেছেন, তার ত ঠিক-ঠিকানা নেই।

কিন্তু কই ? আমি ত শুনিনি।

রিকশায় চড়ে ওদের বাড়ি যাচ্ছি। দু'পাঁচ মিনিট কেউই কোন কথা বললাম না। হঠাৎ অঞ্জলি প্রশ্ন করল, কি ভাবছেন ?

কিছু না।

হতেই পারে না।

কেন ?

ভাবতে ভাবতে আপন মনে হাসছেন, তবু বলছেন কিছু ভাবছিলেন না।

এবার আমি স্বীকার করি, ভাবছিলাম আপনার বাবার কথা।

বাবার কথা ?

হ্যাঁ।

বাবার কি কথা ?

আপনার বাবা একটা মজার কথা বলেছেন।

কি কথা বলেছেন ?

বলেছেন, আগে শুধু উনি আমার প্রেমে পড়েছিলেন কিন্তু এখন আপনি আর আপনার মাও আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

মার কথা বলতে পারি না ; তবে আমি আপনার প্রেমে পড়িনি।

কথাটা বলেই অঞ্জলি হাসে। আমিও হাসি। বলি, যাক শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।

মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর ও বললো, তবে আমাদের বাড়িতে আপনি খুব পপুলার।

বাড়িতে মানে ? আপনার বাবা-মার কাছে ?

আমার কাছেও আপনি আনপপুলার না।

জেনে সুখী হলাম।

খাবার টেবিলের সামনে গিয়েই অবাক হই। বলি, এত খাবার কেউ খেতে পারে ?

মিসেস ব্যানার্জী বললেন, এমন কিছু বেশী দেওয়া হয় নি।

এত খাবার সামনে থাকলে আমি বসতেও পারব না।

ডক্টর ব্যানার্জী বললেন, গতবার তোমাকে ভাল করে খাওয়াতে পারেন নি বলে…

অঞ্জলি ওর বাবাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললো, অযথা নিজের দাম না বাড়িয়ে খেতে বসুন। মা অনেক কষ্ট করে রান্না করেছেন।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিই, আপনার মত আধুনিকা যে এসব রান্না করতে পারবে না, তা আমি জানি।

ডক্টর ব্যানার্জী আমাকে বকুনি দিলেন, তুমি ওকে আপনি বলে আরো মাথায় চড়াচ্ছো।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, একমাত্র বাবা-মার একমাত্র মেয়েকে আমার মাথায় চড়াতে হবে না।

ওরা তিনজনেই হাসেন।

হাসতে হাসতেই ডক্টর ব্যানার্জী বললেন, তুমি যা বলতে চাও [illegible] বাবা-মা [illegible] হয়েছে [illegible]

অঞ্জলি নিজের [illegible] লুকিয়ে নেয়। মিসেস ব্যানার্জী স্বামীকে বকুনি দেন, [illegible] অসভ্যতা করছ [illegible]

আগ্রা থেকে ফিরে আসার পর দু'একদিন মনটা একটু চঞ্চল থাকে। কাজকর্মের মাঝে মাঝেই আনমনা হয়ে যাই। ক'দিন পর আবার নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

একটু বেলাতেই ঘুম থেকে উঠি। তিন-চার কাপ চা খেতে খেতে খবরের কাগজগুলো পড়ি। ঐ কাগজ পড়তে পড়তেই টেলিফোন আসে নানাজনের কাছ থেকে। আমিও টেলিফোন করি এম পি মন্ত্রী আর কিছু অফিসারকে। তারপর বাথরুম। পোশাক পরিবর্তন। ব্রেকফাস্ট। তারপর গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়েই বেরিয়ে পড়ি পার্লামেন্ট, নানা মিনিস্ট্রি, এম. পি-দের আড্ডাখানা, পার্লামেন্টারী পার্টির মিটিং, প্রেস কনফারেন্স। সব শেষে অফিস। কোনদিন ঘণ্টাখানেকের জন্য ডিপ্লোম্যাটিক ককটেল পার্টিতেও যেতে হয়। নিজের আস্তানায় ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। আগ্রার কথা মনে করার অবকাশও পাই না।

মাস তিনেক পরে আগ্রা থেকে ব্যানার্জী দম্পতি ও অঞ্জলির সই করা ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড পেলাম। পরের দিন হোটেলের গ্রীটিংস কার্ডে অঞ্জলি লিখেছে—আপনি ভুলে গেলেও আমরা আপনাকে ভুলিনি।

অঞ্জলির মন্তব্যটা পড়েই হাসি। একসাথে, 'আমরা' লিখে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে।

চিঠিপত্র লিখে লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভ্যাস আমার নেই। [illegible] চিঠি লিখলাম। উত্তর ব্যানার্জীর চিঠিতে ওদের [illegible] পেলাম। হোটেলের ঠিকানা [illegible] —

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] তোমার বাসা।

এইভাবেই চলছিল কাউন্টারের সামনে একটু গল্প, টেলিফোনে একটু হাসিঠাট্টা। কখনও আমার ঘরে পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য দেখাশুনা। অথবা সাইকেল রিকশায় পাশাপাশি বসে ওদের বাড়ি যাবার পথে একটু নিবিড় সান্নিধ্য।

সেবার নির্বাচনী প্রস্তুতি কভার করতে সব চাইতে আগে ইউ. পি. যাব ঠিক করলাম। প্রথমেই আগ্রা। সন্ধ্যের পর সাইকেল রিকশায় আমরা দুজনে ওদের বাড়ি যাচ্ছি। হঠাৎ অঞ্জলি বললো— এবার থেকে আপনি আর আমাকে আপনার ঘরে যেতে বলবেন না।

কেন কি হলো?

কিছু হয় নি। তবে সবাই তো আপনার সঙ্গে আমার এই ঘনিষ্ঠতা দেখে সুখী হয় না।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে নাকি ?

ঘনিষ্ঠতা হয় নি বলেই তো কোন না কোন অজুহাতে প্রত্যেক মাসে আগ্রা আসছেন।

কাজেও আগ্রা আসব না ?

আপনাদের কাগজে বুঝি শুধু আগ্রার খবরই ছাপা হয় ? খুশির হাসি হেসে অঞ্জলি আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে খানিকটা গাম্ভীর্য এনে বললাম, আগ্রা ইজ নট অ্যান অর্ডিনারী প্লেস।

সত্যি কথাটা বলতে এখনও এত দ্বিধা ?

আমি গম্ভীর হয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, দ্বিধা ? কিসের দ্বিধা ?

অঞ্জলি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো, থাক, আর অভিনয় করতে হবে না।

অভিনয় ?

আবার ন্যাকামি ?

ন্যাকামি ?

এবার ও অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, আপনি যে এত ভীতু, তা আমি ভাবতে পারিনি।

আমি ভীতু ?

একশ' বার।

আমি মোটেও ভীতু না। তাছাড়া আমি কাকে ভয় করব ?

আমাকে।

আপনাকে আমি ভয় করি ?

সত্যি কথাটা না বলতে পারার তাইতো মানে হয়।

আপনি সব সত্যি কথা বলতে পারেন?

প্রয়োজন হলেই বলতে পারি।

প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা বাদ দিন। আমি প্রশ্ন করব, আপনি জবাব দিতে পারবেন?

পারব না কেন?

আপনার ধারণা আমি বিশেষ কোন কারণের জন্য মাঝে মাঝেই আগ্রা আসি?

হ্যাঁ।

আপনার মতে সেই বিশেষ কারণটা কি?

বলব না।

হা ভগবান, আপনিও আমার মত ভীতু।

দুজনেই হাসি।

কর্মজীবনের তাগিদে, সংবাদপত্রের সেবা করার জন্য আমাকে ছুটে বেড়াতে হয় গ্রাম-গঞ্জ, শহর-নগর, স্বদেশ-বিদেশ। থাকি ছোট-বড় বা মাঝারি হোটেলে। কখনও কখনও সার্কিট হাউস বা সরকারী অতিথিশালায়। সব হোটেলের রিসেপশনেই অমায়িক ব্যবহার পাওয়া যায়। পাই। তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য নেই কিন্তু দূরাগত মানুষকে খুশী করে।

পরিচয়ের আগে অঞ্জলির সৌজন্য, ভদ্রতা, মুখের হাসি আমার ভাল লেগেছিল। আরো ভাল লাগল আলাপ হবার পর। সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ মেলামেশার মধ্যেও বেশ একটু দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ভাল লাগার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলিকে একটু শ্রদ্ধাও করতে শুরু করেছি। তাইতো আমার নিঃসঙ্গতার বেদনা, শূন্যতার জ্বালা দূর করার আশায় ওর বন্ধুত্বের লোভ সংবরণ করতে পারিনি।

(আলাপ-পরিচয় হবার পর অঞ্জলিও যেন দু'এক ধাপ এগিয়ে এলো।...)

(হঠাৎ আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে অঞ্জলি আমাকে প্রশ্ন করল, নানা জায়গায় নানা হোটেলে থাকতে থাকতে নিশ্চয়ই আমার মত অনেক মেয়ের সঙ্গেই আপনার আলাপ হয়েছে ?

এক হোটেলে দু'চারবার যাতায়াত করলেই আলাপ-পরিচয় হয় বৈকি তবে আপনার সঙ্গে যেমনভাবে মিশছি ঠিক এমনভাবে কারুর সঙ্গে মেশার সুযোগও হয় নি, আগ্রহও হয় নি।/

ও একটু হেসে বললো, আগ্রহ হলেও হয়ত স্বীকার করছেন না।

আমিও হাসি। বলি, না, না, স্বীকার করব না কেন ?

সব সময় সব কিছু কী স্বীকার করা যায় ?

আমি তর্ক করি না। প্রসঙ্গ বদলে অন্য কথা বলি কিন্তু মনে মনে হাসি। ভাবি, অন্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে কিনা সেকথা ভেবে অঞ্জলি এখনই ঈর্ষা করছে ? তবে কী অঞ্জলি আমাকে ভালোবাসে ? এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিজেই নিজেকে বলি, না, না, ভালোবাসবে কেন ? এ তো নিছক কৌতূহল। ফেমিনাইন কিউরিওসিটি।

(অঞ্জলিকে আমিও ভালোবাসি না কিন্তু নিশ্চয়ই ওকে আমার ভাল লাগে। ও শুধু সুন্দরী নয়, বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই ; নেই কোন উচ্ছলতাও। হোটেলের রিসেপশনে কাজ করতে করতে সবার সঙ্গেই হাসি মুখে কথা বলার অভ্যাস হয়ে গেছে কিন্তু বিন্দুমাত্র চটুলতা নেই ওর মধ্যে। নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে না রাখলেও যে মেয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে, তার মাধুর্যই আলাদা। অঞ্জলির এই মাধুর্যই আমার সব চাইতে বড় আকর্ষণ।/

কথায় কথায় অঞ্জলিকে প্রশ্ন করি, এতদিন ধরে এই হোটেলে

আসা-যাওয়া করছি কিন্তু কোনদিন তো বুঝতে দেন নি আপনি বাঙালী ?

জানতাম একদিন না একদিন আলাপ হবেই তাই…

আপনি জানতেন আলাপ হবেই ?

হ্যাঁ।

কিভাবে ?

প্রত্যেক ভি-আই-পি ভিজিটের পরই বাবার কাছে নানা গল্প শুনতাম।…

কিসের গল্প ?

ভি-আই-পি'র গল্প, আপনাদের গল্প।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, আপনাদের গল্প ?

হ্যাঁ, ভি-আই-পি পার্টির জার্নালিস্টদের গল্প।…

আমাদের নিয়ে আবার কী গল্প করতেন ?

আপনাদের কাণ্ডকারখানা।

হা ভগবান।

এবার অঞ্জলি একটু হেসে বললো, বাবা দু'একবার আপনার প্রশংসা করতেই মা একদিন বললেন, ছেলেটাকে একদিন নিয়ে এসো।…

তারপর ?

তাই জানতাম, আপনার সঙ্গে আলাপ হবেই। অঞ্জলি একটু থেমে বললো, আপনিও তো কোনদিন আমার সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহ দেখান নি ? প্রশ্ন করার সঙ্গেই একটু অনুযোগ, মাঝে মাঝেই তো ভরদ্বাজের সঙ্গে গল্প করতেন কিন্তু আমি পাশে থাকলেও শুধু হ্যালো বা 'গুডমর্নিং—গুড ইভনিং' এর বেশী কপালে জোটেনি।

এবার আমিও হেসে বললাম, আমিও জানতাম, একদিন আমাদের পরিচয় হবে, ঘনিষ্ঠতা হবে। তাই…

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললো, নিজের মাথায় বুঝি কোন বুদ্ধি এলো না ?

এই পৃথিবীর মত প্রত্যেকটি মানুষেরও এক একটা নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে। কিছু মানুষকে আমরা সবাই কাছে টানি ; দু'একজনকে প্রাণের কাছে পেতে চাই। হঠাৎ মনে হয়, আমরা কী দুজনকে কাছে টানছি ?

আগ্রা থেকে দিল্লী ফিরে এলেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। খুব নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে টুকটাক চিঠিপত্রের লেনদেন হয়। অঞ্জলি লেখে, রবি ঠাকুর পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রত্যেকটি চিঠির জবাব দেবার সময় পেতেন কিন্তু আপনার সে সময়টুকুও নেই দেখে একটু অবাক না হয়ে পারছি না। আমার কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু মার চিঠির জবাব না দেবার জন্য আমরা সবাই অত্যন্ত অপমানিতবোধ করছি।

আমি ওর চিঠি পড়েই হাসি। তাই তো ওর মাকে লিখি, শুধু পাটালি গুড়ের পায়েস খাবার লোভে কলকাতায় গিয়েও যে তিন সপ্তাহ আটকে পড়ব, তা ভাবতে পারিনি। আজ সকালে ফিরে এসেই আপনাকে চিঠি লিখছি। আরো নানা কথা লেখার পর লিখি, আপনার অহংকারী মেয়েকে বলবেন, দু'এক মাসের মধ্যেই তাকে চিঠি দিচ্ছি।

তিন-চারদিন পরেই অঞ্জলির একটা পোস্টকার্ড পাই—আপনি কি ফাল্গুনেই আমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে চান ?

কাজকর্মের মাঝখানে অবসর পেলেই অঞ্জলির কথা মনে পড়ে। হয়ত চিঠি লিখি। কখনও কখনও ওর পুরানো চিঠিগুলো পড়ি।

এই ভাবেই দিনগুলো কেটে যায়।

দিল্লী থেকে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেই আগ্রা পাওয়া যায়। ঘুরে-ফিরে দিল্লী এসেই টেলিফোন করে বললাম, সেদিন লজ্জায়

আপনাকে সত্যি কথাটা বলতে পারি নি। বোধহয় আপনার জন্যই এত ঘন ঘন আগ্রা যাই।

এখনও বোধহয় ?

বোধহয় মানে...

আর মানে বোঝাতে হবে না। আমি জানি আপনি কার জন্য আগ্রা আসেন।

আপনি জানেন ?

জানি বৈকি।

কি করে জানলেন ?

এটুকু বোঝার মত বয়স বা বুদ্ধি আমার নিশ্চয়ই...

ওর প্রতিটি কথায় একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করছি। আনন্দে ও আগ্রহের আতিশয্যে ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, অনেক কিছুই বোঝার মত বয়স বা বুদ্ধি আপনার হয়েছে কিন্তু আমি কার জন্য আগ্রা যাই, তা জানলেন কি করে ?

এসব জানতে হয় না, অনুভব করতে হয়।

আমি আর কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না। বিমুগ্ধ মনে শুধু বললাম—ধন্যবাদ।

মাঝে মাঝে টেলিফোন করবেন।

করব।

পরের দিন সকালেই অঞ্জলির টেলিফোন এলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি খবর ?

কালকে একটা কথা বলা হয় নি।...

কি বলা হয় নি ?

আমার মনে হয় আমাকে আপনি আপনি করে কথা না বলাই উচিত।

তবে কি তুমি বলব ?

আপত্তি আছে নাকি ?

আপত্তি নেই মানে···

ইফ নট এনিথিং উই আর অ্যাটলিস্ট ফ্রেণ্ডস্‌।

অফ কোর্স।

তাছাড়া বাবা-মা তো আপনাকে বহুবার···

গুরুজনদের ক'টা কথা আমরা শুনি ?

অঞ্জলি হাসে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে বললাম—তাহলে তুমিও আমাকে আপনি বলতে পারবে না।

পারব না ?

না।

মুহূর্তের জন্য অঞ্জলি বোধহয় কি ভাবল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—কবে আগ্রা আসছ ?

রবিবার।

ঠিক তো ?

তোমার কাছে প্রথম প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাখব না ?

দিনগুলো যেন ঝড়ের বেগে কেটে যায়। কোথা দিয়ে যে মাসের পর মাস পার হয়ে গেল, তা বুঝতেই পারলাম না।

সময় পেলেই তাজ এক্সপ্রেসে আগ্রা যাই। দু-একদিন কাটিয়ে আসি। আজকাল সব সময় ঐ হোটেলে উঠি না। মাঝে মাঝেই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের অতিথিশালায় বা উত্তরপ্রদেশ সরকারের কোন ইন্সপেকশন বাংলোয় উঠি। ডক্টর ব্যানার্জী ও তাঁর স্ত্রী অবশ্য প্রত্যেকবারই বলেন, আমাদের এত বড় বাড়ি থাকতে তুমি কেন যে অন্য জায়গায় থাক তা বুঝি না।

আমি হেসে বলি, চাকর-বাকর আর্দালী-বেয়ারারা আমাকে এত ভালোবাসে ও এত আদর-যত্ন করে যে হোম কমফর্টে আমার মন ভরে না।

ওরা কিছু বলার আগেই অঞ্জলি বললো, তাহলে বিয়ে করে সংসার করবেন কি করে?

বিয়ে? বিয়ে আমার কপালে নেই।

আমার কথায় ডক্টর ব্যানার্জী আর তাঁর স্ত্রী হাসেন। অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললো, এখনই এত হতাশ হচ্ছেন কেন?

বাংলা খবরের কাগজের পাত্র-পাত্রী কলমে তিন-চারবার বিজ্ঞাপন দিয়েও যার কোন হিল্লে হয় না, সে হতাশ হবে না?

ওরা তিনজনেই হাসিতে ফেটে পড়েন।

খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব আর একটু ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েই দিনগুলো বেশ কেটে যায়।

ইন্সপেকশন বাংলোর বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে আমি আর অঞ্জলি গল্প করছিলাম। অনেকক্ষণ অনেক কিছু নিয়ে কথাবার্তা বলার পর আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তুমি কখনও তাজে যাও না? নাকি তোমার বাবা আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের বড় অফিসার বলে তাজ সম্পর্কে তোমার কোন আগ্রহ নেই?

একটু শুকনো হাসি হেসে কেমন যেন একটু বিবর্ণ, বিষণ্ণ হয়ে অঞ্জু বললো—তাজে আমি বেড়াতে যাই না।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, তাজে বেড়াতে যাও না?

না।

ওর কথা শুনে আমি চুপ করে রইলাম। আকাশ-পাতাল অনেক কিছু ভাবলাম কিন্তু কোন কূলকিনারা পেলাম না।

কয়েক মিনিট দুজনের কেউই কোন কথা বললাম না। তারপর

অঞ্জলি হেসে বললো—তোমার ভয় নেই, আমি কারুর সঙ্গে প্রেম করতে যাই না।

আমিও হেসে জানতে চাইলাম, ঠিক তো?

ও আমার কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বললো—ভাল কথা, আমি দিল্লী আসছি।

সত্যি?

তবে কি আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি?

তোমার বাবা-মার সঙ্গে আসছ?

না, না, আমি একা··

একা? আনন্দে আমি প্রায় মূর্ছা যাই।

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললো—একা মানে হোটেল থেকে আমরা তিনজন একটা সেমিনারে যাচ্ছি।

কবে?

সাতাশে।

এই সাতাশে?

তবে কি ডিসেম্বরের সাতাশের কথা বলছি?

ক'দিন থাকবে? কোথায় উঠবে?

সেমিনার পাঁচ দিনের। তবে একদিন আগে যাব, একদিন পরে ফিরব।···

থাকবে কোথায়? আমার ওখানেই?

তোমার বউ কিছু বলবে না?

না, না, কিচ্ছু বলবে না। তোমার স্বামীর মত আমার বউও এসব বিষয়ে অত্যন্ত উদার।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

হাসি থামলে অঞ্জলি বললো—থাকব জনপথ হোটেলে। সেমিনার ওখানেই হবে।

তুমি ছাড়া আর কারা যাচ্ছেন ?

একজন মালিকের বউ আর···

মালিকের বউ ?

হ্যাঁ, উনি আমাদের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। তবে উনি যাচ্ছেন মেনলি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে।

আরেকজন কে ?

ফুড অ্যাণ্ড বেভারিজ ম্যানেজার। তবে ইনি সস্ত্রীক যাচ্ছেন বলে হয়তো হোটেলে না থেকে শালার বাড়িতেই থাকবেন।

আমি খুশির হাসি হেসে বললাম, তার মানে সেমিনারের পর তোমার কোন অভিভাবক বা অভিভাবিকা মাতব্বরী করবেন না।

তুমি তো থাকবে।

আগ্রা ছাড়ার আগে ডক্টর ব্যানার্জীর স্ত্রী আমাকে বললেন—অঞ্জু একটা সেমিনার অ্যাটেণ্ড করতে দিল্লী যাবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—তাই নাকি ? কিসের সেমিনারে যাচ্ছে ?

উনি সবিস্তারে সব কিছু বলার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি ওর সঙ্গে যাচ্ছেন তো ?

ওদের হোটেলের মালিকের স্ত্রী যখন যাচ্ছেন তখন আর আমি যাই কেন ?

তাছাড়া আমাদের মত লোক কি জনপথ হোটেলে থাকতে পারে ?

আমার আস্তানা তো আছে।

ডক্টর ব্যানার্জী আলোচনায় যতি টেনে বললেন—না, না, উনি যাবেন না। তুমি রোজ অঞ্জুর একটু খোঁজখবর নিও আর পারলে পার্লামেন্ট দেখিয়ে দিও।

আমি অঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললাম, ভাল করে শুনে নাও।

যে ক'দিন দিল্লীতে থাকবে সে ক'দিন আমিই তোমার অভিভাবক। কথাবার্তা না শুনলে···

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ও বললো—বেত মারবেন?

ওর কথায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

সাড়ে চারটে-পাঁচটা নাগাত সেমিনার শেষ হত। মিসেস শ্রীবাস্তব কোনদিনই লাঞ্চের পর সেমিনারে যেতেন না। আত্মীয়দের কাছে চলে যেতেন। ফিরতেন ডিনারের পর। তবে সন্ধ্যের পর আত্মীয়দের বাড়ি থেকেই অঞ্জুকে ফোন করতেন, তুমি কি বিশ্রাম করছ?

হ্যাঁ। বেশ টায়ার্ড লাগছে।

তাহলে আর কোথাও বেরিও না। বিশ্রাম নাও।

আমি তো ভাবছি একটু ঘুমিয়ে নেব।

ঘুমোও কিন্তু খেতে ভুলে যেও না।

আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক খেয়ে নেব।

ফুড অ্যাণ্ড বেভারিজ ম্যানেজার দু'বেলাই সেমিনারে যোগ দিতেন কিন্তু শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যেতেন।

অঞ্জু টেলিফোন নামিয়ে রাখতেই আমি বললাম—আমি চলি।

কেন?

তুমি তো এখন ঘুমুবে।

ও হাসতে হাসতে বলে, আগে কখনও মিথ্যে কথা বলতাম না। আর এখন তোমার জন্য বোধহয় সত্যি কথা বলাই ভুলে গেছি।

(কিছু না হারিয়ে তো কিছু পাওয়া যায় না) একটু থেমে বললাম, আগ্রায় সম্রাট শাজাহান মমতাজকে হারিয়েছিলেন আর আমি আগ্রাতে গিয়েই মমতাজকে···

ও যেন ভয়ে আতঙ্কে চমকে উঠল। আমার মুখে হাত দিয়ে বললো—লক্ষ্মীটি, ওকথা মুখেও উচ্চারণ কর না।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন? কি হয়েছে?

এবার আগ্রা এলে তোমাকে দেখাব, সব কথা বলব।

॥ দুই ॥

মমতাজ।

খানিকটা দূরে আলখাল্লা পরা পাগলটা চিৎকার করতেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

মমতাজ! সন্ধ্যে হয়ে গেল। তুমি আমাকে গান শোনাবে না?

আমি অঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করলাম—হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

খুব চাপা গলায় ও বললো—কথা বলো না।

হঠাৎ একটু জোরে হেসে উঠে পাগলাটা বললো, কি গান গাইবে, তাও বলে দিতে হবে? মুহূর্তের মধ্যে ওর হাসি উড়ে গেল। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে আপনমনে বললো, মমতাজ, ইমন কল্যাণ ছাড়া আর কি গাইবে? তোমাকে সারা জীবনই শুধু ইমন কল্যাণ গাইতে হবে।

আমি কোন কথা না বলে চুপ করে অঞ্জুর পাশে দাঁড়িয়ে আছি।

হল্ট্! সাইলেন্স প্লীজ!

পাগলের চিৎকার শুনে একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখি। না, আমরা দুজনে ছাড়া আর কেউ নেই।

চুপ। মমতাজ গাইছে।

পাগলটা মাথা কাত করে কানের পাশে হাত দিয়ে এমনভাবে দাঁড়াল যেন সে সত্যি সত্যি কারুর গান শুনছে।

আঃ! চমৎকার! ক্যায়সে যাউ ঘরওয়া ম্যয় ঝনন ঝনন বাজে ঘুংড়ুয়া…।

না, না, মমতাজ, তোমাকে আসতেই হবে। মমতাজ! মমতাজ! তুমি না এলে আমি বাঁচব কি করে? আমি কিছুতেই বাঁচব না; না, না, কিছুতেই বাঁচব না। তোমাকে আসতেই হবে।

ক্যায়সে যাউ ম্যয় ঝনন ঝনন বাজে ঘুংড়ুয়া, এক ডর হ্যায় মুঝে শাস-ননদকো তুঝে জাগব হ্যায় দেবর বা।...

আঃ! লাভলি! ধা ধিন ধিন ধা, ধা ধিন ধিন ধা, না তিন তিন তা, তেতে ধিন ধিন ধা/ধা ধিন ধিন ধা/ধা ধিন ধিন ধা...

পাগলটা যেন কার গান শুনছে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে নিজে গাইছে। মুখে তবলার বোল বলছে। কখনও নিজের মাথায় তবলা বাজাচ্ছে। আমরা চুপ করে ঐ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলের পাগলামি দেখছি কিন্তু আর কতক্ষণ? বললাম, অঞ্জু, আর কতক্ষণ পাগলের পাগলামি দেখব?

তুমি ওকে পাগল বলবে না।

ওর কণ্ঠস্বর শুনেই একটু বিস্মিত হলাম। গোধূলির বিলীয়মান আলোয় ওর দিকে তাকিয়ে আমি আরো বিস্মিত হলাম। সারা মুখে বেদনার ছাপ। ধ্রুবতারার মত ওর উজ্জ্বল দুটি চোখ আরো বেদনার্ত; টলটল ছলছল করছে। আমি হতবাক হয়ে কখনও পাগলের গান শুনছি, কখনও অঞ্জুকে দেখছি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পাগলের গান থামল। চিৎকার করে উঠল, মমতাজ! গান শুনিয়েই চলে যেও না, যেও না, যেও না...

হঠাৎ বিদ্যুদ্‌বেগে অঞ্জু ছুটে গিয়ে পাগলটাকে জড়িয়ে ধরেই কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করল, দাদা, তুমি কেঁদো না।

আমিও ছুটে গেলাম কিন্তু ওদের পিছনে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম।

পাগলটা একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললো, কে ? দিদি ?

ও কোন জবাব দিল না, দিতে পারল না।

দিদি ! তুই মমতাজের গান শুনেছিস ?

অঞ্জু কোনমতে বললো, হ্যাঁ, শুনেছি।

দিদি, মমতাজের মত ইমন কল্যাণ আর কেউ গাইতে পারবে না, তাই না রে ?

অঞ্জু শুধু একটু মাথা নাড়ল।

দিদি, আমি ঠিক তাল দিয়েছি ? ধা ধিন ধিন ধা, ধা ধিন ধিন ধা, না তিন তিন তা···

তোমার সব কিছু ভুল হয়ে যাবে কিন্তু ইমন কল্যাণের তাল কোনদিন ভুল হবে না।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন নাটক দেখছি কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কে এই পাগল ? অঞ্জুর দাদা ? নিজের দাদা ? ডক্টর ব্যানার্জীরই ছেলে ? কে এই মমতাজ ? গান, ইমন কল্যাণ, ধা ধিন ধিন ধা···

সব মিলিয়ে আমার মাথায় তালগোল পাকিয়ে গেল।

দাদা, বাড়ি চলো।

মমতাজ ! মমতাজ যাবে না ?

পরে যাবেন।

কেন ? ও কি রেওয়াজ করছে ?

হ্যাঁ।

না, না, দিদি, তাহলে ওকে বিরক্ত করো না। চল আমরা পালাই।

হঠাৎ পাগলটা অঞ্জুর হাত ধরে দৌড়তে শুরু করল। ওদের পিছন পিছন আমিও দৌড়লাম।

বাইরে গিয়ে দেখি ডক্টর ব্যানার্জী গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

অঞ্জু তাড়াতাড়ি পাগলটাকে গাড়ির মধ্যে তুলে দিতেই ডক্টর ব্যানার্জী গাড়ি স্টার্ট দিলেন।

কোন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন সার্জন কথা বলেন না, বলতে পারেন না, তেমনি ডক্টর ব্যানার্জীর গাড়ি চলে যাবার পর পরই অঞ্জলি কোন কথা বলতে পারল না। স্থবিরের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তাজমহলের সারা চত্বরে এখন কোন দর্শনার্থী নেই। শুধু কয়েকজন পাহারাদার ছড়িয়ে ছিটিয়ে সম্রাট শাজাহানের এই অমর কীর্তি পাহারা দিচ্ছে।

আমি দু-এক পা এগিয়ে আলতো করে ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, চলো, বাড়ি পৌঁছে দিই।

না, না, এখুনি বাড়ি যাব না।

কোথায় যাবে? আমার সঙ্গে ইন্সপেকশন বাংলোয় যাবে?

হ্যাঁ, তাই চলো।

তাজমহলের চত্বর থেকে বেরিয়েই একটা সাইকেল রিকশায় উঠলাম। রিকশায় দুজনের কেউই কোন কথা বললাম না।

ইন্সপেকশন বাংলোয় পৌঁছেই অঞ্জলি বললো, আমার ঐ পাগল দাদার জন্যই আমাকে তাজে যেতে হয়, নয়ত…

বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললাম, বুঝলাম।

দু'এক মিনিট ও কোন কথা বললো না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, চা খাবে?

খাব।

আমি বেয়ারাকে ডেকে দু'কাপ চা দিতে বললাম।

একটু পরেই চা এলো।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, উন্মাদ লোকের মনে যে এত স্নেহ থাকে, তা জানতাম না।

সত্যি, আমার প্রতি দাদার স্নেহের কোন তুলনা হয় না। একটু চুপ করে থাকার পর অঞ্জলি বললো, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমার কোন সিরিয়াস অ্যাকসিডেণ্ট বা ঐ ধরনের কোন বিপর্যয় দেখা দিলে বোধহয় সেই শক্-এ দাদা ভাল হয়ে যাবে।

আমি বললাম, এটা কি কোন সমাধান ?

জানি এটা কোন স্বাভাবিক সমাধান নয় কিন্তু এ ধরনের কোন সমাধান ছাড়া আর বোধহয় কোন পথ নেই।

তাছাড়া অ্যাকসিডেণ্টের মত কোন বিপর্যয়ই যে হতে হবে, তার কি মানে আছে ?

অঞ্জলি একটু ম্লান হাসি হাসল।

আবহাওয়া একটু স্বাভাবিক করার জন্য আমি হেসে বললাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়াটা কি সিরিয়াস অ্যাকসিডেণ্টের চাইতে কম বিপর্যয় ?

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললো, তা ঠিক। মুহূর্তের জন্য একটু থেমে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার মত আর ক'জন মেয়ের জীবনে এ রকম বিপর্যয় ঘটিয়েছ ?

অনেক।

খুব স্বাভাবিক।

খুব স্বাভাবিক কেন ?

তোমাকে যখন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় তখন শুধু আগ্রাতেই এসেই যে তুমি প্রথম ধরা পড়লে বা ধরা দিলে, তা কি বিশ্বাস করা সম্ভব ?

কখনই না।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠি।

হাসি থামলে দু-এক মিনিট চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, অঞ্জু, একটা কথা বলব, বিশ্বাস করবে?

বিশ্বাস করব না কেন?

জীবনে প্রাণভরে কারুর ভালবাসা না পেয়ে নিজেকেই ঘেন্না করতে শুরু করেছিলাম।··

তাই বলে নিজেকে ঘেন্না করবে?

আমি একটু শুকনো হাসি হেসে বললাম, কোথায় যেন পড়েছিলাম If nobody loves you, be sure it is your own fault.

আমার কথা শুনে ও একটু হাসল।

হাসছ? কবি সত্যেন দত্তর অনুবাদ করা কবিতার একটা লাইনই শুধু মনে আছে···

বলো, শুনি।

লাইনটা হচ্ছে—একাকী যদি কাটিল কাল, বাঁচিয়া সুখ নাই।

অঞ্জু আমার একটা হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, তোমাকে দেখেই আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল।

কেন?

হোটেলে তুমি হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব করতে। সবাই বেশ উপভোগ করত। কিন্তু আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল তুমি ধূমকেতুর মত কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছ।

আমি খুশীর হাসি হেসে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি করে বুঝলে?

তোমার মুখের দিকে তাকালেই স্পষ্ট বুঝতে পারতাম।

আমি হেসে বললাম—তাহলে আমি তোমার গেলাস ভরে দেবার আগেই তুমি চুরি করে সুরাপান শুরু করেছিলে।

অঞ্জু কথাটা চাপা দেবার জন্য বললো—তুমি অবশ্য আমার চাইতে বিজয়া সম্পর্কেই বেশী আগ্রহী ছিলে।

তাই নাকি ?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমি হেসে বললাম—তুমি সত্যি আমাকে ভালবাসো।

হঠাৎ এ কথা বলছ ?

Love looks through a telescope ; envy through a microscope.

আমরা দুজনেই খুব জোরে হেসে উঠলাম।

হাসি থামলে অঞ্জলি একটু আনমনা হয়ে গেল। হাসিখুশী ভরা উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানা ম্লান হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তেব মধ্যে। তারপব বললো—সত্যিই কাউকে ভালবাসতে চাই নি।

কেন ?

ভয় কবে।

ভয় করে ?

হ্যাঁ ভয় করে।

আমি আলতো করে ওর কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলাম—ভয় করে কেন ?

দাদার জন্য।

দাদাব জন্য ?

হ্যাঁ, দাদার জন্য। ভালবেসেছিল বলেই তো দাদার এই অবস্থা।

আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম—ভালবাসলেই কি সবার ঐ অবস্থা হয় ?

অনেকের হয় না ঠিকই কিন্তু যদি আমার জন্য…

আমি ওকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বললাম—এই সব আজে-বাজে কথা কেউ ভাবে ?

কিন্তু যদি আমি হারিয়ে যাই, যদি তুমি সে দুঃখ সহ্য করতে না পেরে…

তুমি হারিয়ে যাবে না।

ও একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বললো—তুমি জানো আমি হারিয়ে যাব না?

জানি।

কি করে জানলে?

আমার মন বলছে।

তুমি আমাকে ধরে রাখতে পারবে?

একশোবার পারব।

তুমি ঠিক দাদার মত কথা বলছ।

আচ্ছা ইনি কি তোমার আপন দাদা?

আপন দাদার চাইতে অনেক বেশী।

আমি আর প্রশ্ন করলাম না। চুপ করে রইলাম।

একটু পরে ও আমাকে প্রশ্ন করল—দাদার কথা জানতে চাও?

বলো।

সে অনেক বছর আগেকার কথা। প্রায় কুড়ি বছর হবে। ডক্টর ব্যানার্জী নতুন আগ্রায় এসেছেন। অঞ্জলি তখন নেহাতই শিশু।

ডক্টর ব্যানার্জী তাঁর তাজমহলের অফিসে গিয়েছেন। ওঁর স্ত্রী সংসারের কাজকর্ম শেষ করতেই পিয়ন এলো চিঠি দিতে। অনেক দিন পর মা-র চিঠি পেয়েই উনি চিঠি পড়তে পড়তে রান্নাঘরে চলে গেলেন। তারপর স্নান করতে বাথরুমে। ওর মনেই নেই যে বাইরের ঘরের দরজা খোলা।

অঞ্জলি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনের রাস্তার মানুষ গাড়ি-ঘোড়া মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। তারপর কখন যে সে আপন মনে

রাস্তায় বেরিয়ে এদিক-ওদিক হাঁটতে শুরু করেছে, তা ওর খেয়াল নেই।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই ডক্টর ব্যানার্জীর স্ত্রী মেয়েকে ডাক দিয়ে কোন জবাব না পেয়েই চমকে উঠলেন। একে একে সব ঘর, খাটের তলা, আলমারির কোণা টেবিলের তলা দেখলেন। না, মেয়ে নেই। সামনের দরজা, বাইরের গেট খোলা। মিসেস ব্যানার্জী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেলেন পাশের বাড়ি। তারা খবর দিলেন ডক্টর ব্যানার্জীকে। খবর পেয়েই উনি ছুটে এলেন বাড়ি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু শুনে নিয়েই উনি আবার বেরিয়ে গেলেন। অঞ্জলিকে খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন আরো অনেকে।

বেলা দেড়টা-ছুটো নাগাত ডক্টর ব্যানার্জী একবার বাড়ি এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, অঞ্জু ফিরেছে ?

না, না, আমার অঞ্জু এখনও ফেরে নি।

ডক্টর ব্যানার্জী স্ত্রীকে সান্ত্বনা না জানিয়েই আবার বেরিয়ে গেলেন। থানায় খবর দিলেন। ছুটে গেলেন প্রতিটি হাসপাতালে। না, এ রকম কোন মেয়ে অ্যাকসিডেন্ট কেসে ভর্তি হয় নি। ঘুরে বেড়ালেন আগ্রা সিটি, ফোর্ট, ক্যাণ্ট, রাজা-কা-মণ্ডী রেলস্টেশনে। প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্ম, রেস্টুরেন্ট, ওয়েটিংরুম দেখেও অঞ্জুর কোন হদিস পাওয়া গেল না।

এবার ডক্টর ব্যানার্জী সত্যি হতাশ হয়ে পড়েন। চোখের পাতা ভিজে ওঠে। হৃৎপিণ্ড ওঠা-নামা করতে করতেই মাঝে মাঝে যেন চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায়। আগ্রা ক্যাণ্ট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে পড়েন। ভাবেন আকাশ-পাতাল। একবার মনে হয় বাড়ি ফিরে গিয়ে খবর নেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পিছিয়ে আসেন—না, না, যদি অঞ্জু না ফিরে থাকে, তাহলে…

ডক্টর ব্যানার্জীর ছু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মাথা ঝিম-

ঝিম করে, সারা পৃথিবী অন্ধকার মনে হয়। হাত-পা কাঁপে। তবু বসেন না, বসতে পারেন না। আবার বেরিয়ে পড়েন। ঘোরাঘুরি করেন রাস্তাঘাট বাজার-হাট। না, কোথাও তাঁর অঞ্জুকে দেখতে পান না। তারপর হঠাৎ মনে হয়, অঞ্জু ঘুরতে ঘুরতে তাজে যায় নি তো? তাজের মধ্যে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো?

ডক্টর ব্যানার্জী আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাজের দিকে রওনা হন। তাজে যাবার পথেও সোজা যেতে পারেন না। এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে যান। না, হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ লোক চোখে পড়লেও অঞ্জুকে দেখা যায় না।

শেষে তাজের গেটের কাছে পৌঁছতেই রতনলাল ছুটতে ছুটতে এসে বললো, সাব জলদি বাড়ি যান। মুন্নী এসে গেছে।

অঞ্জু ফিরে এসেছে?

হাঁ সাব। আপনি বাড়ি যান।

বেলা তখন চারটে-সাড়ে চারটে। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয় নি। তবু ডক্টর ব্যানার্জী উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

বাড়ির সামনে এসে ডক্টর ব্যানার্জী ভিড় দেখে থমকে দাঁড়ান। ভাবেন, তবে কী অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে? এইটুকু শিশু অ্যাকসিডেণ্ট হলে কী বাঁচবে? মনের মধ্যে নানা আশঙ্কার দোলা খেতে খেতেই ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢোকেন।

না, অঞ্জুর অ্যাকসিডেণ্ট হয় নি।

অঞ্জু হাসতে হাসতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছিল জানো?

আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী হাতি চড়ে যাচ্ছিল। এত কাছ থেকে অত বড় বড় হাতি দেখে আমার এত আনন্দ হল যে আমি ঐ হাতির পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করলাম।

তারপর ?

বেশ অনেক দূর যাবার পর ওরা হাতি থেকে নামল। হাতি-গুলোকে গাছের সঙ্গে বাঁধল। ঘাস-পাতা খেতে দিল।...

আর তুমি হাঁ করে দেখছ ?

হ্যাঁ। হাতির খাওয়া দেখে আমার সে কী আনন্দ।

বাড়ি ফেরার কথা একবারও মনে হয় নি ?

একবারও না।

খিদেও পায় নি ?

নিশ্চয়ই পেয়েছিল কিন্তু হাতির কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে আমি এমনই মশগুল হয়েছিলাম যে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনেও আসে নি।

তারপর ?

তারপর ঐ হাতি দেখার জন্য আস্তে আস্তে অনেক ছেলেমেয়ের ভিড় জমে উঠল। কেন জানি না কিছুক্ষণ পরে ঐ সন্ন্যাসীরা আমাদের সবাইকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিল।

আমি ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাতেই ও বললো, আমি কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির পরই কাঁদতে শুরু করলাম। এমন সময় একদল বড় বড় ছেলে স্কুল থেকে ফিরছিল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ছোটবেলা থেকেই জ্বালাতন করা স্বভাব।

অঞ্জু আমাকে একটু বকুনি দিল, বকবক করো না। যা বলছি শোন।

বলো।

ওরা সবাই মিলে আমাকে আমার নাম-ধাম বাবার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করায় আমি আরো বেশী ঘাবড়ে আরো জোরে কাঁদতে শুরু করলাম।

খুব ভাল কাজ করলে।

আবার টিপ্পনী কাটছ ?

আচ্ছা আর কিছু বলব না।

শেষে একটি ছেলে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে আর সবাই চলে গেল।

এই তো তোমার দাদা ?

হ্যাঁ। এবার অঞ্জু হেসে বললে, দাদার পকেটে যে দুচার পয়সা ছিল তাই দিয়ে আমাকে টফি কিনে দিল। তারপর আমাকে অনেক আদর করে আমার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করার পর আমি শুধু আমার নাম বললাম।

আর কিছু বললে না ?

আর বাড়ি সম্পর্কে কি যেন বলেছিলাম, ঠিক মনে নেই।

তাহলে তোমার দাদা তোমাকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছলেন কি করে ?

তিন-চার ঘণ্টা আমি দাদার কাঁধে চড়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমাদের বাড়ির সামনে এসে হাজির হতেই···

থাক। আর বলতে হবে না।

॥ তিন ॥

বিশ্বনাথ দাস সেন্ট্রাল রেলের সাধারণ টিকিট ক্যালেক্টর। মাইনে সামান্যই। তবে কিছু উপরি পাওনা আছে। তবুও তিনটি ছেলে, স্ত্রী আর বুড়ো বাবার দায়িত্ব যেন সামলাতে পারেন না।

ছেলেদের মধ্যে দেবাশিস্‌ই সবার বড়। ক্লাস টেনে পড়ে। আর দুই ছেলেও স্কুলে পড়ে। বাবার ডিউটির কোন ঠিক-ঠিকানা নেই বলে দেবাশিস্‌কেই বাজার-হাট বা সংসারের অন্য সব কাজ করতে হয়। একটা সংসারের বাইরের কাজ কী কম ?

বাজার থেকে ফিরতে না ফিরতেই মা বলেন, দেবু, দাদুর ওষুধটা এনে দিবি না ?

দেবাশিস্ জানে, ও ছাড়া আর কেউ নেই যে ঘণ্টাখানেক-ঘণ্টা দেড়েক ডিসপেন্সারীতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ওষুধ আনতে পারে। কাল স্কুলে অনেক পড়াশুনা আছে। ডিসপেন্সারী থেকে আসার পর হয়তো এমন ক্লান্ত হয়ে যাবে যে পড়তে বসলেই ঘুম পাবে। তবু বললো, প্রেসক্রিপশন দাও।

মা ওর হাতে প্রেসক্রিপশন দিতে দিতে বললেন, একবার ডাক্তারবাবুকে বলিস যে আজ তিন দিন দাদুর পায়খানা হয় না। কোন একটা ওষুধ যেন দেন।

দেবাশিস্ মুখে কিছু বললো না। মনে মনে ভাবল, তাহলে ডাক্তারবাবুর কাছেও লাইন দিতে হবে।

ওদের কোয়ার্টার থেকে ডিসপেন্সারী বেশ খানিকটা দূর। বড়

নালার ধার দিয়ে গেলে একটু কাছে হয় কিন্তু বড্ড নোংরা। তাই ঘুরে যেতে হয়। ভাল রাস্তা দিয়ে গেলে প্রায় মাইলখানেক রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে দেবাশিস্ ভাবে, একটা সাইকেল হলে এত পরিশ্রম হয় না। স্কুল, বাজার-হাট, ডিসপেন্সারী ঘোরাঘুরি করে এত সময় নষ্ট হয় না। কিন্তু কোথায় পাবে সাইকেল? বাবাকে বলার সাহস ওর নেই। তাছাড়া বলেই বা কি লাভ। সাইকেল কিনে দেবার মত অবস্থা তার নয়।

ডিসপেন্সারী থেকে ফিরতে ফিরতে আটটা বেজে যায়। মা বলেন, এবার তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বোস।

দেবাশিস্ একটু হাসে। মনে মনে বলে, সংসারের সব কিছুই আগে। তারপর আমার পড়াশুনা। পড়তে বসতে বসতেই সাড়ে আটটা বাজে। ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই ক্লান্তিতে ঘুম আসে। হাই ওঠে। তবু কোনমতে দশটা-সওয়া দশটা পর্যন্ত পড়াশুনা করে। তারপর খেয়ে-দেয়ে এগারোটা নাগাত শুয়ে পড়ে।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেও স্কুল যাবার আগে পর্যন্ত পুরো সময়টা পড়াশুনায় দিতে পারে না। সকালবেলায় চা খেতে খেতেই বাবা ডাক দেন, দেবু, শুনে যা।

দেবু ওর বাবার সামনে হাজির হতেই উনি একটা টাকা বের করে বলেন, দৌড়ে দু-প্যাকেট পাসিংশো আর একটা দেশলাই আন তো।

দেবাশিস্ সিগারেট-দেশলাই এনে দিয়ে পড়তে বসলেই মেজ ভাই বলে, দাদা, আমি দুধ নিয়ে আসার পর তুই আমাকে অঙ্কগুলো একটু দেখিয়ে দিবি?

দেবাশিস্ দুটি ছোট ভাইকেই বড্ড ভালবাসে। কোন ব্যাপারেই ওদের অনুরোধ ও উপেক্ষা করতে পারে না। বললো, দেব না কেন?

এইভাবেই দিনগুলো কাটছিল। এমন সময় হঠাৎ এই অঘটন।

কৃতজ্ঞ ডক্টর ব্যানার্জী বিশ্বনাথবাবুকে বলেন, আপনার ছেলের জন্য আমি আমার মেয়েকে ফেরত পেলাম।

না, না, ও কথা বলবেন না। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আপনার মেয়েকে পৌঁছে দিত।

ডক্টর ব্যানার্জীর স্ত্রী বলেন, পৌঁছে দিত কী নিয়ে পালিয়ে যেত, তা কে বলতে পারে।

দেবাশিসের মা বললেন, দেবু পৌঁছে দিয়ে ভালই করেছে কিন্তু তাই বলে এত মিষ্টি আনলেন কেন?

মিসেস ব্যানার্জী বললেন, ওসব কথা বলবেন না দিদি। ও মিষ্টির মালিক দেবুরা তিন ভাই।

অনেকক্ষণ অনেক গল্পগুজব হবার পর ডক্টর ব্যানার্জী বিশ্বনাথ-বাবুর হাত ধরে বললেন, সামনের রবিবার দুপুরে বা বিকেলে, যখন আপনার সুবিধে হয়, আমাদের সঙ্গে আপনারা সবাই একটু ডাল-ভাত খাবেন।

ব্যস্ত কী? পরে হবে।

মিসেস ব্যানার্জী বললেন, না, না, দাদা, আপত্তি করবেন না। দয়া করে আসবেন। আমরা খুব আনন্দ পাব।

বিশ্বনাথবাবু বললেন, আপনি ওভাবে বলবেন না।

কিন্তু আপনাদের আসতেই হবে।

আচ্ছা আসব, তবে দুপুরেই আসব।

খুব ভাল হবে।

বিশ্বনাথবাবুর কোয়ার্টার থেকে বেরুবার আগে মিসেস ব্যানার্জী ওদের তিন ভাইকে আদর করার পর দেবুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, কাল একবার আসবে না বাবা?

সলজ্জ দেবাশিস্ বললো, চেষ্টা করব।

লক্ষ্মী বাবা আমার, একবার পাঁচ মিনিটের জন্য এসো। খুব খুশী হব।

দেবুর মা বললেন, অত করে বলছেন কেন? স্কুল থেকে ফেরার সময় একবার ঘুরে আসবে।

দেবু অঞ্জুকে কোলে নিয়ে একটু এগুতেই অঞ্জু বললো, দাদা, কাঁধে চড়ব।

ডক্টর ব্যানার্জী হাসলেও ওর স্ত্রী মেয়েকে একটু বকুনি দেন, কি অসভ্য মেয়ে। দাদাকে কষ্ট দেয়।

দেবু হাসতে হাসতে বললো, কষ্ট কী? কাঁধে নিলে বেশ মজা লাগে।

এইভাবেই দুই পরিবারের হৃদ্যতা শুরু। দিনে দিনে সে হৃদ্যতা বেড়েছে।

মিসেস ব্যানার্জী দেবুকে সাইকেল কিনে দিয়েছেন। তাকে আর হেঁটে হেঁটে ঘোরাঘুরি করতে হয় না। তাছাড়া রোজ একবার সে অঞ্জুর কাছে আসবেই। কিছুক্ষণ দুই ভাইবোনে খেলাধুলা না করলে বোধহয় কারুর চোখেই ঘুম আসবে না।

রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেবু বলে, মাসীমা, আমি যাচ্ছি।

পাঁচ মিনিট দাঁড়া।

কেন?

একটু দরকার আছে।

একটু পরেই মিসেস ব্যানার্জী একটা টিফিন কেরিয়ার দেবাশিস্‌কে দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে যা। মাকে দিবি।

দেবাশিস্ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, এতে কী আছে মাসীমা?

কিচ্ছু নেই। তোকে নিতে বলছি, তুই নিয়ে যা।

কিছু নেই কিন্তু বেশ ভারী…

এটা নিতে তোর সাইকেলের টায়ার ফেটে যাবে?

দেবাশিস্ পরের দিন একসঙ্গে দুটো খালি টিফিন কেরিয়ার মাসীমাকে দিয়ে বলে—মাসীমা, কাল ছানার জিলেপীগুলো দারুণ হয়েছিল।

উনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, তুই একলাই বোধহয় অর্ধেক শেষ করেছিলি?

না, না, মাসীমা, মাত্র দশ-বারোটা খেয়েছি।

তুই এত মিষ্টি খাবি না। শেষে ক্রিমি হলে মজা বুঝবি।

দেবাশিস্ আবার হাসে। বলে, তার জন্য ত আপনি দায়ী। আমার কোন দোষ নেই।

আমি দায়ী?

একশ'বার।

আমি কী অপরাধ করলাম শুনি।

আপনি এত মিষ্টি তৈরী করেন যে বাধ্য হয়ে আমাকেও খেতে হয়।

ঠিক আছে। এবার থেকে ঘোড়ার ডিম খাওয়াবো।

আমাকে মিষ্টি না খাওয়ালে আপনার ঘুম হবে না।

আচ্ছা দেখা যাবে।

বেশী দিন নয়, মাত্র তিন-চার দিন পরেই স্কুল ছুটির পর দেবাশিস্ আসতেই অঞ্জলি ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, জানো দাদা, আজ বাবার জন্মদিন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। অঞ্জলি চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, দেখবে চলো, মা কত কি রান্না করছে।

দেবাশিস্ রান্নাঘরের দরজার কাছে যেতেই মিসেস ব্যানার্জী বলেন, ডাইনিং টেবিলের উপর তোর খাবার ঢাকা আছে। আগে খেয়ে নে। তারপর আমার একটা কাজ করে দিবি।

দেবাশিস্ কোন প্রতিবাদ করে না। স্কুলের বইপত্তর রেখে হাত মুখ ধুয়ে খাবার খেতে গিয়েই আপন মনে হাসে। অঞ্জলি ওর কাছেই দাঁড়িয়েছিল।

ও জিজ্ঞাসা করে, দাদা, তুমি হাসছ কেন?

দেবাশিস্ ওর ফোলা ফোলা গাল টিপে আদর করে বলে, জানিস দিদি, মাসীমা বলবেন মিষ্টি খেও না কিন্তু উনি সব সময় আমার জন্য মিষ্টি রাখবেন।

মা যে বলেন, তুমি মিষ্টি খেতে ভালবাসো।

মিষ্টি খেতে সবাই ভালবাসে।

আমারও মিষ্টি খেতে খুব ভাল লাগে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দেবাশিস্ আবার রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়ায়। বলে, মাসীমা, আমাকে মিষ্টি খেতে বারণ করেছেন বলেই কি অতগুলো ছানার জিলেপী রেখেছিলেন?

বাঁদর ছেলে! তুইই ত সেদিন ছানার জিলেপীর কথা বললি।

দেবাশিস্ হাসে। হাসবে না কেন? সে স্পষ্ট বুঝতে পাবে, এ বাড়িতে সে পার্শ্ব চরিত্রের অভিনেতা নয়।

সেদিন বৃষ্টির মধ্যে দেবাশিস্‌কে আসতে দেখেই অঞ্জলি চিৎকার করে উঠল, মা, দাদা একেবারে ভিজে গেছে। শীগগির এসো।

ওর মা পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেই বলেন, হা ভগবান। যা যা শীগগির জামা-প্যান্ট ছাড়। এত বৃষ্টির মধ্যে কেউ বেরোয়?

না, না, মাসীমা, এমন কিছু ভিজিনি…

বাজে বকিস না। তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট ছেড়ে আমার একটা শাড়ি পর।

পরের দিনই দেবাশিসের রেন-কোট কেনা হয়।

দেবাশিসের মা মিসেস ব্যানার্জীকে বলেন, দিদি, এই ছেলের জন্য তুমি ফতুর হয়ে যাবে।

মিসেস ব্যানার্জী একটু হেসে বলেন, দিদি, একটু ভুল হয়ে গেল। দেবু না হলে আমি সত্যি ফতুর হয়ে যেতাম। ওর দেখা না পেলে কী আমরা বাঁচতে পারতাম ?

না বলছিলাম যে তুমি ত সারা বছর ধরেই ওদের তিন ভাইকে কিছু না কিছু দিচ্ছ। তাই...

ও কথা বলো না দিদি। তোমার পেটে হয়েছে বলে কি ওরা আমার ছেলে না ? মিসেস ব্যানার্জী দেবাশিসকে কাছে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, এ হতভাগা সামনের জন্মে আমার পেটেই জন্মাবে।

কোথা থেকে দৌড়ে এসে অঞ্জলি দেবাশিসের হাত ধরে টান দিয়ে বলে, দাদা, দেখবে এসো আমি কি সুন্দর বাড়ি তৈরী করেছি।

মিষ্টি, মেসোমশাই ও মাসীমার চাইতে এই অঞ্জলির জন্যই দেবাশিসকে এখানে নিত্য আসতে হয়। আসতেই হবে। দুপুর-বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর অঞ্জু ঘণ্টাখানেকের জন্য ঘুমোয়। ঘুম থেকে উঠেই জিজ্ঞাসা করবে, মা, দাদা আসেনি ?

একটু পরেই আসবে।

দাদা এত দেরি করে কেন মা ?

স্কুল ছুটি না হলে আসবে কেমন করে ?

তাহলে এখন আমি কী করি ?

তুমি নিজে নিজে একটু খেলা করো। দাদা এখুনি এসে পড়বে

অঞ্জু চলে যায় কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে আসে। বলে, আর কতক্ষণ একলা একলা খেলা করব ?

ওর মা হেসে বলেন, তুমি এবার গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। এখুনি এসে পড়বে।

অঞ্জু সত্যি সত্যি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দেবাশিস্ আসতেই বলে, দাদা তুমি আর ইস্কুলে যাবে না।

দেবাশিস্ ওকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেন দিদি ?

তাহলে আমি একলা একলা থাকি কেমন করে ?

তুমি আমার সঙ্গে স্কুলে যাবে।

অঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে ওর কোল থেকে নেমে দৌড়ে মার কাছে যায়। বলে, মা, কাল থেকে আমিও দাদার সঙ্গে ইস্কুলে যাব।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

দিনগুলো এইভাবে এগিয়ে চলে।

যমুনার জল গড়িয়ে যায়। গ্রীষ্মের পর বর্ষা নামে।

বিশ্বনাথবাবুকে দেখেই ডক্টর ব্যানার্জী এগিয়ে যান। বলেন— আসুন দাদা, আসুন। বৌদি কোথায় ?

আমি একাই এসেছি।

বৌদিকে আনলেন না কেন ?

উনি সংসারের কাজে ব্যস্ত বলে ওকে আনলাম না। তাছাড়া আমি একটু জরুরী কাজে এসেছি।

বিশ্বনাথবাবু ড্রইংরুমে ঢুকতেই মিসেস ব্যানার্জী বললেন, আজ যেমন দিদিকে আনেন নি, তেমনি কালই দিদিকে পাঠাতে হবে।

বিশ্বনাথবাবু হাসেন। মিসেস ব্যানার্জী বাড়ির মধ্যে যান। অঞ্জু এগিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করে, দাদা আসে নি ?

না, মা। দাদা এখন পড়ছে।

মঞ্জুও ভিতরে চলে যায়।

ডক্টর ব্যানার্জী এবার পাশ ফিরে বিশ্বনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, কি যেন জরুরী কাজের কথা…

খুবই ব্যক্তিগত। যদি আপনি কিছু মনে না করেন…

ডক্টর ব্যানার্জী ওর হাতের পর হাত রেখে বললেন, কিছু মনে করব না দাদা। অত দ্বিধা করছেন কেন ?

হঠাৎ ছোট শালীর বিয়ে ঠিক হয়েছে।…

কবে বিয়ে ?

এই তিরিশে।

কোথায় ? কলকাতায় ?

হ্যাঁ।

সবাই যাবেন তো ?

মুশকিল হচ্ছে আপনার বৌদি গেলে ছেলেদের বা বাবাকে কে দেখবে ? তাই যেতে হলে সবাইকেই যেতে হবে।

তা তো বটেই।

কিন্তু আপনাকে একটু কষ্ট দেব। মানে না দিয়ে…

আঃ! আপনি কেন অমন করছেন ? ডক্টর ব্যানার্জী খুব চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু টাকা দরকার ?

হ্যাঁ।

কত ?

শ’তিনেক হলে খুব ভাল হয়।

কালকে দিলে হবে ?

যাবার আগে পেলেই হল।

কালকে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিয়ে আসব।

না, না, আপনাকে যেতে হবে না।

কেন ? দাদার বাড়ি ভাই যায় না ?

বিশ্বনাথবাবু আর তর্ক করেন না। শুধু বলেন, এ টাকা কিন্তু আমি দু'এক মাসের মধ্যে দিতে পারব না।

সে সব কথা পরে ভেবে দেখা যাবে।

ক'দিন পরের কথা।

বিশ্বনাথবাবুর ঘরে বসে ওরা সবাই গল্প করছিলেন। মিসেস ব্যানার্জী বললেন, দাদা, বিয়েতে গেলে দেবুর তো অনেকদিন কামাই হবে কিন্তু এখন কী ওর কামাই করা ঠিক হবে?

ক্ষতি তো হবেই কিন্তু আমরা সবাই যাচ্ছি বলে ওকেও নিয়ে যাচ্ছি।

আমি বলি দাদা, দেবুকে আমার কাছে রেখে যান। ওকে নিয়ে যাবেন না।

দেবুর মা সঙ্গে সঙ্গে ওকে সমর্থন করে বললেন, উনি ঠিকই বলেছেন। দেবু থাক। ক'মাস পরেই তো ওর ফাইন্যাল পরীক্ষা।...

বিশ্বনাথবাবু দেবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে মাসীমার কাছে থাকবি?

দেবাশিস্ বললো, আপনি বললেই থাকব।

তাহলে তুই থাক। সেই ভাল।

দাদা, এই এতগুলো বই তুমি পড়? টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে অঞ্জু প্রশ্ন করে।

দেবাশিস্ হেসে বলে, হ্যাঁ।

আমাকে একটা বই পড়তে দেবে?

তুমি অ—আ পুরো লিখবে। তারপর তোমাকে আমার বই পড়তে দেব।

কিন্তু আমার পেন্সিল তো মা হারিয়ে ফেলেছে!

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। তাইতো আমি লিখতে পারি না।

আচ্ছা কাল আমি তোমার শ্লেট পেন্সিল এনে দেব।

তাহলে আমি কাল লিখব। আজ তোমার একটা বই পড়ি ?

দেবাশীষ ওকে একটা বই দেয়।

দু'চার পাতা উল্টেই জিজ্ঞাসা করে, দাদা, এটা কিসের ছবি ?

এটা একটা দেশের ছবি। একে ম্যাপ বলে।

কী বলে ?

ম্যাপ।

অঞ্জু দৌড়ে মাকে বলে, মা, দাদার বইতে ম্যাপের ছবি দেখেছি।

ওর মা ওকে বলেন, দাদা যখন পড়বে, তখন তুমি দাদার কাছে যাবে না।

কেন মা ?

তাহলে দাদার পড়ার অসুবিধে হবে।

না, না, দাদা আমাকে খুব ভালবাসে।

ওর মা হেসে বলেন, দাদা তোমাকে খুব ভালবাসে কিন্তু পড়ার সময় যাবে না।

তাহলে আমি কি করব ?

তুমি তোমার বই নিয়ে এস। আমার কাছে বসে পড়বে।

আমার তো পেন্সিল নেই।

তাতে কি হলো ?

দাদা বলেছে, কাল পেন্সিল এনে দেবে। আমি কাল পড়ব।

রাত্রে ওরা চারজনে একসঙ্গে খেতে বসেছেন। অঞ্জু বললো, মা, আমি দাদার কাছে শোব।

কেন ?

দাদা বলেছে, অনেক গল্প বলবে।

তারপর মাঝরাত্রে কান্নাকাটি করলে আবার তুমি আমার কাছে চলে আসবে ?

আমি কাঁদবই না।

খাওয়া-দাওয়ার পর অঞ্জলি দেবাশীষের পাশে শুয়ে শুয়ে গল্প শোনে। তারপর রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে অচিন দেশে উড়ে যেতে যেতে অঞ্জুও ঘুমের দেশে চলে যায়। একটু পরে ও মা-র কোলে চড়ে নিজের বিছানায় চলে যায় কিন্তু ভোরবেলায় উঠেই কাঁদতে শুরু করলো, দাদা কোথায় ?

ওর বাবা বললেন, দাদা পড়ছে।

সপ্তাহ খানেক যেতেই অঞ্জু সত্যি সত্যিই ওর দাদার পাশে শুয়ে শুয়ে গল্প শোনে, ঘুমোয়। কোনদিন বেশি রাত্রে মা-র কাছে যায়, কোনদিন যায় না।

রবিবার দেবাশীষের স্কুল নেই। একটু দেরি করে পড়তে বসে। সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জু এসে ওর পাশে দাড়ায়। জিজ্ঞাসা করে, আজ তো ছুটি। আজ পড়ছ কেন ?

দেবাশীষ ওর মুখের সামনে থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলে, কালকের পড়া পড়ছি।

অঞ্জলি ওর হাত ধরে টানে, না, না, দাদা, ছুটির দিনে পড়তে নেই। আজকে শুধু গল্প করতে হয় আর খেলতে হয়।

ডক্টর ব্যানার্জী মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে বলেন, চল, আমরা একটু ঘুরে আসি।

না, না, আমি এখন যাব না। দাদার সঙ্গে খেলব।

আচ্ছা আমার সঙ্গে ঘুরে এসেই খেলবে।

দেরি করবে না তো ?

না, না, দেরি করব না।

সত্যি সারাটা দিন ওরা প্রাণভরে আনন্দ করে। বিকেল-

বেলায় চা-জলখাবার খেতে খেতে দেবাশীষ হাসতে হাসতে বলে, মাসীমা, বাবা-মা ফিরে এলে আমি অঞ্জুকে বাড়িতে নিয়ে যাব।

উনি হাসতে হাসতে জবাব দেন, আমি তো ভাবছি, আমি তোকেই যেতে দেব না। তোর মত একটা ছেলের আমার খুব দরকার।

অঞ্জুর মত একটা বোনও আমার দরকার।

তারপর একদিন দেবাশীষের বাবা-মা ফিরে আসেন। দেবাশীষ তার বাবা-মার কাছে ফিরে যাবে কিন্তু অঞ্জু ওকে পাগলের মত জড়িয়ে ধরে বললো, না দাদা, তুমি যাবে না। তুমি আমার কাছে থাকবে।

সবাই মিলে ওকে কত কথা বললেন, কত খেলনা আর চকোলেটের লোভ দেখালেন, কিন্তু না, অঞ্জু কিছু চায় না। ও শুধু ওর দাদাকে চায়।

দেবাশীষের বাবা-মা একটু থমকে দাঁড়ালেন। মনে মনে বোধ-হয় বুঝলেন, এই নিষ্পাপ অবোধ শিশুর ভালবাসা থেকে দেবুকে বেশীদিন দূরে রাখা মুশকিল।

দেবাশীষ চলে যায় কিন্তু প্রতিদিন আসে। না এসে পারে না। ওকে আসতেই হয়। কোথাকার কোন এক অদৃশ্য শক্তি ওকে রোজ অঞ্জলির কাছে টেনে আনে।

কোন কোন শনিবার দেবাশীষ স্কুল থেকে এসেই বলে, মাসীমা, আজ আমি অঞ্জুকে নিয়ে যাচ্ছি। মা বলেছেন।

ওকে নিয়ে গেলে তো তোদের তিন ভাইয়ের পড়াশুনা ডকে উঠবে।

না, না, আমাদের পড়াশুনার কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। ও তো মা-র সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

অঞ্জলি আনন্দে, খুশিতে প্রায় নাচতে নাচতে দেবাশীষের সাইকেলে চড়ে। চলে যায়।

দেখতে দেখতে যমুনার জল আরো গড়িয়ে যায়। ক্যালেণ্ডারের নতুন পাতাগুলো পুরনো হয়ে যায়। দেবাশীস কলেজে ভর্তি হয়। অঞ্জলিও স্কুলে যায়।

সন্ধেবেলায় বিশ্বনাথবাবু সস্ত্রীক আসতেই মিসেস ব্যানার্জী জিজ্ঞাসা করলেন, দাদা, আপনি নাকি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন?

হ্যাঁ, বুড়ো বয়সে একটা পরীক্ষা দিলাম।...

ডক্টর ব্যানার্জী প্রশ্ন করলেন, কিসের পরীক্ষা?

এ-এস-এম'এর।

বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রী খুশির হাসি হেসে বললেন, আজ খবর এলো পাসও করেছেন।

ডক্টর ব্যানার্জী বিশ্বনাথবাবুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, এই না হলে আমার দাদা!

মিসেস ব্যানার্জী বললেন, তাহলে আজ না খাইয়ে ছাড়ছি না।

বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রী বললেন, না ভাই, আজ না। আমি রান্না করেই এসেছি।

মিসেস ব্যানার্জী মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, তা জানি না। দাদা পাস করেছেন আর আমি না খাইয়ে ছেড়ে দেব? তা হতেই পারে না।

চেতে বসে বিশ্বনাথবাবু ডক্টর ব্যানার্জীকে বললেন, পরীক্ষায় পাস করেও সমস্যা আছে।

কেন?

হয়তো বদলি করবে।

তা করুক। চাকরিতে উন্নতি হলে বদলিতে আপত্তি কী?

তা ঠিক, তবে ছেলেদের পড়াশুনায়...

ওসব পরে ভাবা যাবে। সমস্যার সমাধানও থাকে।

মাস খানেকের মধ্যেই বিশ্বনাথবাবুকে বীণা জংশনে এ-এস-এম করে বদলির অর্ডার এল। ওরা সবাই চলে গেলেন। শুধু দেবাশীষ আগ্রাতেই থাকল।

॥ চার ॥

অঞ্জলি একটু হেসে বললো, ঐ ক'বছরের মধ্যে দাদা আমাদের কত কাছের মানুষ হলো, তা তুমি ভাবতে পারবে না। মা আর মাসীমা রইলেন না, মা ওর ছোট মা হলেন আর আমি হলাম দিদি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার দাদা ওর বাবা-মা-ভাইদের কাছে যেতেন না?

ছুটি হলেই আমি আর দাদা চলে যেতাম। কখনও কখনও বাবা-মাও যেতেন।

ওরা আসতেন না?

জ্যেঠু আর বড়মা খুব কম আসতেন। তবে মেজদা-ছোড়দা মাঝে মাঝে আসত।

তারপর?

অঞ্জলি যেন আমার প্রশ্ন শুনতে পায় না। আপন মনে পুরনো দিনের স্মৃতির অরণ্যে বিচরণ করতে করতে বললো, ছোটমামার বিয়ের সময় বাবা কিছুতেই ছুটি পেলেন না। মা কি বললেন, জান?

কী?

মা বললেন, তুমি ছুটি পাবে না বলে কি আমার ছোটভাইয়ের

বিয়েতে যাব না ? আমি আমার ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

শুনে আমি হাসি।

অঞ্জলি বললো, সত্যি, আমি, মা আর দাদা চলে গেলাম। ও একটু হেসে বললো, দাদা বড় হবার পর মা-র গায়ের জোর বেড়ে গেলো। কদাচিৎ কখনও বাবার সঙ্গে ঝগড়া হলেই মা বলতেন, এখন আমার ছেলে বড় হয়ে গেছে। আমাকে ভয় দেখিও না।···

দেবাশীষ বেড়িয়ে-টেড়িয়ে বাড়ি ফিরতেই অঞ্জলি ওকে বলে, আজ বাবা-মার খুব ঝগড়া হয়েছে।

দেবাশীষ আর কিছু না শুনেই পাশের ঘরে যায়। জিজ্ঞাসা করে, ছোট মা, তুমি এত গম্ভীর কেন ? কি হয়েছে ?

তোর কাকুকে জিজ্ঞাসা কর।

ডক্টর ব্যানার্জীকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই উনি বলেন, দেখ দেবু, তোর জন্য আমি তোর ছোট মা-র কাছে সব সময় হেরে যাচ্ছি। কথায় কথায় আমাকে ভয় দেখায়···

দেবাশীষ পুরো কথা না শুনেই ওদের দুজনকে দু'পাশে নিয়ে মাঝখানে বসে দু'হাত দিয়ে দুজনকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে ছুঁয়ে তোমরা প্রতিজ্ঞা করো আর কোনদিন তোমরা ঝগড়া করবে না।

অঞ্জুর মা হাসতে হাসতে বলেন, এমন প্রতিজ্ঞা কেউ করতে পারে ? সংসারে কখনও কখনও ঝগড়া হবেই।

তাই বলে ছেলেমেয়ের সামনে ঝগড়া করতে তোমাদের লজ্জা করে না ?

তুই আমাকে এত বকবি না।

এখুনি কাকুর সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক কর।

ওরা দুজনে লজ্জায় হাত বাড়িয়ে দিতেই অঞ্জলি বলে, দাদার কাছে তোমরা বেশ জব্দ।

অঞ্জুর মা সঙ্গে সঙ্গে ওকে বকুনি দেন, তুই আর বেশী বকবক করিস না। তোর জন্যই ত ঝগড়া হলো। তোর বাবা আর দাদা তোকে আদর দিয়ে দিয়ে এমন মাথায় চড়িয়েছে যে···

অঞ্জু ওর বাবা-মাকে বুঝতে না দিয়ে দেবুকে একটু ইসারা করে বলে, তুমি যে আদর দিয়ে দাদাকে মাথায় চড়িয়েছ, সে খেয়াল আছে?

ওর মা সাফ জবাব দেন, বেশ করেছি। ও ছেলে আর তুই মেয়ে; সেকথা ভুলে যাস না।

ডক্টর ব্যানার্জী হাসতে হাসতে ওঁর স্ত্রীকে বলেন, যাই বলো, তুমি দেবুকে বেশী ভালবাসো।

তুমি যেমন মেয়েকে বেশী ভালবাসো আমিও সেই রকম ছেলেকে বেশী ভালবাসি—এ তো জানা কথা। এবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, তুই তো দুদিন পর পরের ঘর করতে চলে যাবি আর আমাদের কথা ভুলেও মনে করবি না কি···

ওর মাকে পুরো কথাটা বলতে না দিয়েই অঞ্জু বলে, তোমার আদরের ছেলেও বউ নিয়ে সংসার করতে চলে যাবে।

দেবু ওর ছোট মার হাত ধরে টেনে তুলে বলে, যেমন বউ এনে দাওনি, তেমন খেতে দেবে চলো।

দেবুর কথায় সবাই হাসেন।

দিনগুলো বেশ কেটে যায়। গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-হেমন্ত, শীত-বসন্তের চাকা ঘুরে চলে।

দাদা, তুমি পড়ছ না?

পড়ছি তো।

তাহলে হাসছ কেন?

হাতের বইটা পাশে সরিয়ে রেখে দেবু একটু হেসে বলে, জানিস দিদি, আজ একটা মজা হয়েছে।

কী মজা হয়েছে ?

আজ শঙ্কুদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

তাতে কি হলো ?

শঙ্কু ভিতরে গিয়েছিল আর আমি যখন একলা বসেছিলাম তখন হঠাৎ ওর বোন এসে আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল।

কার চিঠি ?

আমার চিঠি।

তোমার চিঠি ?

হ্যাঁ।

কে লিখেছে ?

চিত্রা।

চিত্রাদি তোমাকে চিঠি লিখল কেন ?

বেশ কষ্ট করে হাসি চেপে রেখে দেবু বলে, লিখবে না ? ও যে আমাকে ভালবাসে।

কী বললে দাদা ?

দেবু হাসতে হাসতে বলে, কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না ? এই ত্যাখ কি লিখেছে।

অঞ্জু চিঠিটা হাতে নিয়েই পাশে রেখে দেয়। পড়ে না। বলে, দাদা, আমাকে সব কথা না বলে কি তুমি শান্তি পাও না ?

দিদি, তোকেও যদি সব কথা না বলি তাহলে আর কাকে বলব ?

তাই বলে…

অঞ্জুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও বলে, তুই যে আমার দিদি। তোকে আমার সব কথা বলতেই হবে।

সব কথা কি কাউকে বলা যায় ?

যদি ভালবাসা যায়, যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই

বলা যায়। দেবু একটু থেমে আবার বলে, এই সংসারের অধিকাংশ মানুষই ভালবাসতে জানে না। সম্পূর্ণ মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে ত বিশ্বাস করতে অসুবিধে নেই।

এবার অঞ্জু হাসে। বলে, আমি যদি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি?

কার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবি? আমার বিরুদ্ধে?

হ্যাঁ।

দেবু ঠোঁট উল্টে বললো, নারে দিদি, পারবি না।

অঞ্জু দেবুর বুকের 'পর মাথা রেখে বলে, দাদা, তুমি মানুষ না।

ওদিকে বিশ্বনাথবাবু প্রায়ই তার স্ত্রীকে বলেন, যাই বলো, বাড়িতে একটা মেয়ে না থাকলে ঠিক মন ভরে না।

বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রী হাসতে হাসতে বলেন, তুমি একটা চিঠি লিখলেই ত মেয়ে এসে যাবে।

তা ত আসবে কিন্তু পড়াশুনার যে ক্ষতি হবে।

তাহলে পাস নিয়ে ক'দিনের জন্য ঘুরে এসো।

ছুটি পেলে ত প্রত্যেক মাসে যেতে পারি কিন্তু এই হতচ্ছাড়া রেলের চাকরিতে কী ছুটি পাবার উপায় আছে? উনি একটু থেমে বলেন, হ্যাঁগো, তুমি বরং ছেলেদের সঙ্গে গিয়ে একবার মেয়েটাকে দেখে এসো। মেয়েটা যাবার জন্য বার বার করে লিখছে। এবার না গেলে ও নিশ্চয়ই রেগে যাবে।

আমি ত যখন তখন ছেলেদের সঙ্গে যেতে পারি কিন্তু তুমি না গেলে কী ও মেয়ের রাগ কমবে?

এবার বিশ্বনাথবাবু হেসে বলেন, তা ঠিক। ও হতভাগী আমাকে বড্ড ভালবাসে।

দিন দুয়েক পরেই অঞ্জুর চিঠি আসে—বড়মা, তুমি জ্যেঠুকে বলে দিও উনি যেন আমাকে নতুন মা বলে না ডাকেন। আমি সত্যিই

যদি তাঁর নতুন মা হতাম, তাহলে জ্যেঠু আমাকে এতদিন না দেখে থাকতে পারতেন না। আমি জানি জ্যেঠুর ছুটি পাওয়া সহজ নয় কিন্তু তাই বলে এতদিনের মধ্যে একবার আসারও সময় হলো না?

অঞ্জুর চিঠির সঙ্গে ওর মার চিঠি—দাদা, যেভাবেই হোক অঞ্জুর জন্মদিনে আসবেন। গতবার আসতে পারেন নি; এবার না এলে মেয়ে সত্যি রেগে যাবে।

বিশ্বনাথবাবু ডিউটি থেকে ফিরতেই ওর স্ত্রী বললেন, টেবিলের উপর চিঠি আছে।

বিশ্বনাথবাবু চিঠি পড়তে পড়তে হাসেন। তারপর বলেন, তোমরা তৈরি হও। শুক্রবার না হলে শনিবার নিশ্চয়ই রওনা হবো।

বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি যাবে?

এর পর না গেলে ও মেয়ে আর আমার মুখ দেখবে নাকি। আমরা ওর সামনে দাঁড়াতে পারব?

যাক। তাহলে শুভবুদ্ধি হয়েছে।

অঞ্জুর জন্মদিন বিশ্বনাথবাবুর কাছে একটা বিরাট উৎসব। বরাবর ওরা যখন আগ্রায় ছিলেন তখন বিশ্বনাথবাবু মাস খানেক আগে থেকেই উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করতেন। মিসেস ব্যানার্জী বলতেন, দাদা, পৃথিবীতে কী আর কারুর মেয়ে নেই? নাকি কারুর মেয়ে হবে না?

বিশ্বনাথবাবু অঞ্জুকে কোলে নিয়ে বলতেন, বৌদি আমার নতুন মার জন্মদিনে আমি যদি হৈ-হুল্লোড় করি, তাতে আপনার হিংসা হয় কেন?

তিন ছেলেই বিশ্বনাথবাবুর সমর্থক। ওরা বলে, আমাদের একটা বোন। তার জন্মদিনেও একটু আনন্দ করব না?

সত্যি খুব আনন্দ হতো অঞ্জুর জন্মদিনে এবং বিশ্বনাথবাবু ডক্টর

ব্যানার্জীকে একটা পয়সাও খরচ করতে দিতেন না। অঞ্জুর ব্যাপারে উনি সব সময়ই একটু বাড়াবাড়ি করতেন। কেউ কিছু বললেই বলতেন, এই নতুন মাকে পাবার পরই আমার প্রমোশন হলো, মাইনে বাড়ল। এই নতুন মাকে না পেলে আজ আমি কোথায় পড়ে থাকতাম, তা কে জানে।

কথাটা মিথ্যা নয়। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও চাকরিতে যে উন্নতি ওর সম্ভব হয় নি, নতুন মাকে পাবার পর বিশ্বনাথবাবু তা যেন অনায়াসেই পেলেন। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে একবার এক সন্ন্যাসী ওকে বলেছিলেন, ফিকর মাত করো বাবুজি, তোমার জীবনে একটা মেয়ে আসবে এবং তারপরই তোমার উন্নতি। সন্ন্যাসীর কথা শুনেই চমকে উঠেছিলেন। নিজের মনেই নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি চরিত্রহীন হবো? নাকি···। লজ্জায়, দ্বিধায়, সঙ্কোচে সন্ন্যাসীর কথা কাউকে বলতে পারেন নি। বিশ্বনাথবাবু যেদিন স্টেশন মাস্টার হলেন, সেদিন স্ত্রীকে সব কথা বলার পর বলেছিলেন, নতুন মাকে পেয়ে আমিও নতুন মানুষ হলাম।

বিশ্বনাথবাবুরা আসার আগের দিন রাত্রে খেতে বসেই অঞ্জু বলে, মা, আমি আর জ্যেঠু এক ঘরে শোব।

ওর মা হেসে বলেন, সে আর নতুন কী? বরাবরই তো জ্যেঠু তোর ঘরে শুয়ে থাকেন।

সত্যি, বিশ্বনাথবাবু এলেই অঞ্জুর সবকিছু বদলে যায়। যে কথা বাবা-মা'কে বলতে পারে না, যেসব অব্দার বাবা-মার কাছে করা যায় না, জ্যেঠুকে সেসব বলতে ওর একটুও দ্বিধা নেই।

জানো জ্যেঠু, আজকাল সব মেয়েরা রুপোর গহনা পরে কিন্তু মা কিছুতেই আমাকে কিনতে দেয় না।

বিশ্বনাথবাবু খুব গম্ভীর হয়ে বলেন, কেন ?

অঞ্জু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, মা বলেন, ভদ্দরলোকের মেয়েরা নাকি রূপোর গহনা পরে না।

তোর মার ধারণা ভুল। আজকাল সব মেয়েরাই রূপোর গহনা পরে। একটু থেমে বিশ্বনাথবাবু জিজ্ঞাসা করেন, নতুন মা, তোর কি রূপোর গহনা পরতে ইচ্ছে করে ?

দারুণ ইচ্ছে করে।

ঠিক আছে ; কালই আমি কিনে দেব।

কিন্তু মা যদি বকে ?

আমি কিনে দেব আর তোর মা বকবে ? অত সাহস তোর মার হবে না।

পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে দুজনের কথা হয়। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর অঞ্জু প্রশ্ন করে, তুমি কী ঘুমুচ্ছ নাকি ?

না, না, ঘুমোব কেন ?

আজ তোমাকে ঘুমুতে দিচ্ছি না।

কেন ?

সারারাত গল্প করব।

সারারাত ?

হ্যাঁ, সারারাত। যেমন এতদিন পরে এসেছ তেমন শাস্তি ভোগ করো।

বিশ্বনাথবাবু হেসে ওঠেন।

না, না, জ্যেঠু, হাসির কথা নয়। সত্যি আজ তোমাকে ঘুমুতে দেব না।

সারারাত না হলেও অনেক রাত পর্যন্ত দুজনের গল্প হয়। পরদিন সকালে বেশ দেরি করেই দুজনের ঘুম ভাঙে। অঞ্জু ঘুম

থেকে উঠেই হাসতে হাসতে সবাইকে বলে, কাল আমি আর জ্যেঠু প্রায় সারারাত গল্প করেছি।

ডকটর ব্যানার্জী বলেন, খুব ভাল করেছ কিন্তু আজ আর তুমি জ্যেঠুকে নিয়ে শোবে না।

কেন ?

কেন আবার ? তোমার পাল্লায় পড়ে রাত জাগলে জ্যেঠুর শরীর খারাপ হয়ে পড়বে।

জ্যেঠু অন্য কোন ঘরে শোবেই না।

মিসেস ব্যানার্জী বলেন, জ্যেঠুর সঙ্গে কি তুমি একাই গল্প করবে ? আমরা করব না ?

অঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, সারাদিন গল্প করতে তো কেউ আপত্তি করছে না। আর রাত্রের জন্য তো বড়মা ছাড়াও দাদা-মেজদা-ছোড়দা আছে।

এই ভাবেই দিনগুলো কাটে।

দেখতে দেখতে আরো কত বছর পার হয়ে গেল। কত কি ঘটে গেল। বিশ্বনাথবাবু রিটায়ার করে দেশে চলে গেছেন। ছোট দুই ছেলে চাকরি করছে।

এদিকে অঞ্জলি বি. এ. পাস করেছে। এবার আগ্রায় এম. এ. পড়বে। ডক্টর ব্যানার্জী অনেক জায়গা ঘুরে আবার আগ্রায় বদলি হয়ে এসেছেন।

আর দেবাশীষ ?

সে আগ্রা ছেড়ে কোথাও যায় নি। এখানেই এম. এ. পড়ার পর আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের অফিসে এক সামান্য চাকরি নিয়েছে।

আচ্ছা দাদা, এতদিন তুমি একলা একলা কাটালে কিভাবে ?

দিদি, তোকে বলছি কিন্তু আর কাউকে বলতে পারবি না।

আচ্ছা বলব না।

একটু চাপা গলায় দেবাশীষ গাইতে শুরু করে—

তুঝে দেখবেকো মুঝে চাহ্ বাঢ়,
বিলাপৈ বিচার সরাহ রটত।...

অঞ্জলি সঙ্গে সঙ্গে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, দাদা. তমি ক্ল্যাসিকাল গান শিখেছ?

বল তো দিদি কী গাইলাম?

জানি না।

সাহানা। দেবাশীষ সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, তাল কি?

জানি না।

ঝাঁপতাল। কত মাত্রার তাল ঝাঁপতাল?

জানি না।

দশ মাত্রার তাল।

কি আশ্চর্য! তুমি তো কিচ্ছু জানাও নি?

দেবাশীষ দু'হাত দিয়ে ওর মাথা ধরে মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলে, ভেবেছিলাম তোর কাছে পরীক্ষা দিয়ে পাস না করলে কাকু বা ছোট মাকে বলব না।

পাস মানে! তুমি তো অনার্স নিয়ে পাস করেছ। গর্বের সঙ্গে অঞ্জলি বলে।

না রে দিদি, অনার্স পাই নি। মোটামুটি পাস করেছি। এখনও অনেকদিন খাটতে হবে।

হঠাৎ তোমার মাথায় গান ঢুকল কেমন করে?

দেবাশীষ একটু হেসে বলল, সে অনেক কথা।

তা হোক, তুমি বল।

সে অনেক গোপন কথা।

আমাকে বলতে পার না, এমন কোন গোপন কথা তোমার থাকতে পারে? অথবা আমার এমন কোন ব্যাপার থাকতে পারে যা তোমাকে বলা যায় না?

না, তা সম্ভব নয়।

তাহলে বল।

আচ্ছা রাত্রে বলব।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়াব পর ডক্টব ব্যানর্জী আর ওর স্ত্রী শুয়ে পড়েন। ওদের দুই ভাই-বোনের চোখে ঘুম নেই। মুখোমুখি বসে। দুজনেই একটু হাসে।

নাও দাদা, এবার বল।

বলছি।

সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দেবাশীষ আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের অফিসে চাকরি করে। অতি সাধারণ মামুলি চাকরি। তা হোক। ও মনে মনে ভাবে, হাজার হোক তাজমহলে আফস। যে সৌধ দেখার জন্য পৃথিবীর মানুষ এখানে ছুটে আসে, যাকে নিয়ে কত কাব্য, কত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, যা লক্ষ-কোটি মানুষের মনে স্বপ্নের জাল সৃষ্টি করেছে. সেই তাজমহলে চাকরি।

দেবাশীষ কাজ করতে করতে ক্লান্ত হলেই একবাব তাজমহল দেখে আসে। আবার অফিসের কাজে মন দেয়। অফিসের দু'চারজন এর জন্য ওকে ঠাট্টাও করে। কমলেশ্বরবাবু বলেন, দেববাবু জরুর সাজাহান ছিলেন। তাই তো একটু পর পরই মমতাজকে দেখতে যান। দেবাশীষ কিছু প্রতিবাদ করে না। একটু হাসে।

পাঁচটার পর ছুটি হলেই সবাই চলে যান। অফিসের দরজায়

তালা পড়ে। দেবাশীষ যায় না। তাজের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। অথবা গার্ডদের সঙ্গে গল্প করে।

আচ্ছা কিষণলাল, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই তাজমহলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ডিউটি দিতে তোমার বিরক্ত লাগে না?

না বাবুজি, একটুও বিরক্ত লাগে না।

কেন? তাজমহল যত সুন্দরই হোক, রোজ রোজ আট ঘণ্টা ধরে একে দেখতে কারুর ভাল লাগে?

প্রথম যখন নোকরিতে ঢুকি তখন তাজ দেখে যত ভাল লাগত এখন তা লাগে না, কিন্তু এখন একদিন তাজ না দেখলেই খারাপ লাগে।

কিন্তু কেন?

কিষণলাল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, এখানে বেশী দিন থাকলে কি যেন হয়ে যায় বাবুজি।

নটবর সিং পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। এবার ও বললো, বাবুজি, আমরা যখন নাইট ডিউটি দিই তখন যেন মনে হয়, কারা যেন রোজ রাত্রে এখানে আসে—ঘুরে-ফিরে বেড়ায়।

বল কী?

হ্যাঁ বাবুজি, ঠিকই বলছি। অনেকে বলে, সাজাহান-মমতাজের আত্মা এখনও এখানেই আছে।

দেবাশীষ আর কিছু জানতে চায় না। কিছু বলে না। চুপ করে বসে থাকে। কত কি ভাবে। আর মনে মনে অনুভব করে, এই তাজমহলের সঙ্গে ওর মন-প্রাণের এক অদৃশ্য যোগাযোগ আছে।

এই ভাবেই চলছিল।

শরৎ পূর্ণিমার ভিড় আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে গেছে। তবু মানুষ আসে। সকাল সন্ধ্যায়।

মানুষের ভিড় থেকে একটু দূরেই বসেছিল দেবাশীষ। হঠাৎ গানের সুর ভেসে এল। অপূর্ব কণ্ঠস্বর। দেবাশীষ মুগ্ধ হয়ে শোনে —তেরো রী চন্দ্র-বদন শোভা-সদন, মদন-মোহন মন রস বস করণ।···

দেবাশীষ গান জানে না, বোঝে না কিন্তু সুর, কণ্ঠস্বর! মন ভরিয়ে দিয়েছে।

একজন অপরিচিত ভদ্রলোক একটু দূরে বসেছিলেন। তিনিও মুগ্ধ। তিনি ঐ দূর থেকেই দেবাশীষকে বললেন, কি অপূর্ব খাম্বাজ!

দেবাশীষ উঠল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। তিন-চারজন মেয়ে একসঙ্গে বসে ঐ গানের কথাই আলোচনা করছিলেন। দেবাশীষ ওদের সামনে এসেই হাতজোড় করে বললে, নমস্কার! কে গাইছিলেন!

একজন বললেন, এই তো আত্রেয়ীদি।

আমি গান জানি না, বুঝি না কিন্তু তবু আপনার গান শুনে এত ভাল লাগল যে···

দেবাশীষের কথা শেষ না হতেই আত্রেয়ী বললো, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

দেবাশীষ বসেই জিজ্ঞাসা করলে, আপনারা নিশ্চয়ই বেড়াতে এসেছেন?

আমি একটা ছোট্ট কলেজের লেকচারার। প্রায় প্রত্যেক ছুটিতেই আমি কিছু ছাত্রীদের নিয়ে এদিকে বেড়াতে আসি।

অন্য একটি মেয়ে প্রশ্ন করলো, আপনিও কি বেড়াতে এসেছেন?

না, আমি এখানে এই তাজমহলের অফিসেই চাকরি করি।

নাম-ধাম জানাবার পালা শেষ হলে আত্রেয়ী বললো, এই তাজমহলের অফিসে চাকরি করেও এই তাজমহলে বেড়াতে আসেন?

হ্যাঁ, সময়টা বেশ কেটে যায়।

তাহলে বাড়িতে কতক্ষণ থাকেন ?

আমি এখানে মেসে থাকি। তাই সন্ধের পর তাস-পাশা না খেলে এখানেই···

রোজ রোজ এখানে বেড়াতে ভাল লাগে ?

হ্যাঁ, ভালই লাগে।

আমিও এখানে অনেকবার এসেছি কিন্তু প্রত্যেকবারেই কি যেন একটু নতুনত্বের স্বাদ পাই।

হয়তো কোন জন্মে এই তাজমহলের সঙ্গে আপনার কোন বিশেষ যোগাযোগ ছিল।

মমতাজ ছিলাম না নিশ্চয়ই!

আত্রেয়ীর হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর ছাত্রীরাও হাসে। হাসতে হাসতে দেবাশীষ বললো, ছিলেন না তাই বা কে জোর করে বলতে পারে ?

ক'মাস পরে ঠিক ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আত্রেয়ীর চিঠি পেয়ে দেবাশীষ অবাক।···সেবার ঐ ভাবে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে আমার গানের প্রশংসা করাতেই বুঝেছিলাম, আপনি নেহাতই সৎ ও সরল মানুষ। ফিরে এসেই আপনাকে একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল কিন্তু পারি নি। বুঝতে পারছি, একটু অন্যায় হয়ে গেছে। যাই হোক ভগবান যীশুর জন্মদিনের সকালেই আগ্রা আসছি দু'দিনের জন্য। দেখা হবে। সম্ভব হলে গানও শোনাব।

আপনার চিঠি পেয়ে তো আমি অবাক।

কেন ?

ভেবেছিলাম, অত আলাপের পর হয়তো ফিরে গিয়েই একটা চিঠি লিখবেন কিন্তু তা যখন পেলাম না···

ভাবলেন ভুলে গেছি ?

সত্যিই তাই মনে করেছিলাম।

আপনার মত সৎ, সরল মানুষকে চট করে ভোলা যায় না।

কি করে জানলেন আমি সৎ বা সরল?

আত্রেয়ী একটু হেসে বললো, পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত বয়স বোধহয় আমার চলে যায় নি।…

দেবাশীষ হাসে।

হাসবেন না। সত্যি বলছি, পুরুষের চোখের দৃষ্টি বা মুখের কথা শুনেই আমরা বুঝতে পারি…

বুঝতে পারেন?

নিশ্চয়ই। তা না হলে এত শিকারী বিড়ালের হাত থেকে আমরা বাঁচি কি করে?

দেবাশীষ আর প্রশ্ন করে না। চুপ করে বসে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বললো, গান শোনাবেন না?

শোনাচ্ছি।

আবার সেই সুরের খেলা, কণ্ঠস্বরের মায়াজাল। দেবাশীষ মুগ্ধ হয়ে শোনে।

শেষ হতেই আত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলো, কেমন লাগল?

খুব ভাল। চমৎকার।

এটা ইমন কল্যাণ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

গতবারের খাম্বাজের চাইতে আজকের ইমন কল্যাণ আরো বেশী ভাল লাগল।

গতবার খাম্বাজ গেয়েছিলাম, তাও মনে আছে?

দেবাশীষ একটু হাসল।

এবার দিন পনোরা পরেই চিঠি আসে—গত সপ্তাহেই ফিরেছি কিন্তু নানা কাজের চাপে এতদিন চিঠি দিতে পারি নি। রাগ করবেন না। গতবার আপনার সঙ্গে সামান্য আলাপ করেই ভাল লেগেছিল ; এবার ভাল করে পরিচয় হওয়ায় আপনার সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল।

চিঠিটা পড়তে পড়তেই দেবাশীষ হাসে। একবার যেন মনে মনে চোখের সামনে আত্রেয়ীকে দেখে। তারপর আবার চিঠি পড়তে শুরু করে—আপনি গান এত ভালবাসেন কিন্তু শিখছেন না কেন? আগ্রায় অনেক ভাল ভাল ওস্তাদ আছেন। গান শিখুন। সত্যি মনে মনে অনেক আনন্দ পাবেন আর কখনো নিঃসঙ্গ মনে হবে না। সব সময়ই কোন না কোন সুরের নেশায় বিভোর থাকবেনই।

আত্রেয়ী সব শেষে লিখেছে, এরপর যখন আগ্রায় যাব, তখন আপনার গানের পরীক্ষা নিয়ে আমি গান শোনাব।

দেবাশীষ সেই রাত্রেই উত্তর লেখে—এই পৃথিবীর অরণ্য-বনানীতে কত রং-বে-রং'এর সুন্দর সুন্দর পাখি আছে কিন্তু তারা সবাই কী গান গাইতে পারে? না। রূপ-সৌন্দর্যহীন কোকিল তাই অনন্য। আমি গান ভালবাসি ; বোধহয় আরো বেশী ভালবাসি আপনার গান। আপনার গান শুনেই আমাকে খুশী থাকতে দিন।

দু'চারটে চিঠিপত্রের লেনদেন হবার পর আবার একদিন সকালের ট্রেনে আত্রেয়ী এসে হাজির। স্টেশনে দেবাশীষকে দেখেই অবাক, আরে, আপনি!

দেবাশীষ একটু হেসে বললো, পরিচিত ও প্রিয়জনরা এলে তাদের অভ্যর্থনা করাই সামাজিক নিয়ম।

আমি পরিচিতা হতে পারি কিন্তু প্রিয়জন ত না।

কে বললো, আপনি আমার পরিচিতা?

তাহলে স্টেশনে এসেছেন কার জন্য?

স্টেশনে রেলগাড়ি দেখতে এসেছি।

ওরা দুজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

দুপুরের দিকে টাঙ্গা চড়ে ফতেপুর সিক্রী যাবার পথে আত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলো, আজ আপনি অফিস গেলেন না ?

না।

কেন ?

ছুটি নিয়েছি।

কেন ? আমি এসেছি বলে ?

না, না, আপনার জন্য ছুটি নিই নি।...

তবে ?

রেলগাড়ি দেখব বলে ছুটি নিয়েছি।

আত্রেয়ী কোনমতে হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলো, রেলগাড়ি দেখা এখনও হয় নি ?

দেবাশীষ বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, না। বোধহয় সারা জীবন ধরে দেখলেও আশা মিটবে না।

আত্রেয়ী কিছুক্ষণ কথা বলে না। বলতে পারে না। মনে মনে কত কি গুঞ্জন করে। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে, আচ্ছা, আমি কী বদলে গেছি ?

শুধু আপনি কেন, আমারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

কিন্তু...

দেবাশীষ একটু হেসে বললো, শীত যত বীরত্বই দেখাক, বসন্তের কাছে তাকে হারতেই হবে। জীবন আপন গতিতে এগিয়ে যাবে ; সে কোন কিন্তু মানে না।

বোধহয় আপনি ঠিকই বলেছেন। কোনদিন ভাবি নি আমার এমন পরিবর্তন হবে।

সেজন্য কী আপনি দুঃখিত ?

না, দুঃখিত না কিন্তু ভয় হয়।

কিসের ভয় ?

ভাবছি, অন্যায় করছি কিনা।

অন্যায় ?

হ্যাঁ। ভয় হয়, আপনার ক্ষতি না করি।

দেবাশীষ মাথা নেড়ে বললো, আপনি ভুল করেও আমার ক্ষতি করবেন না।

কী করে জানলেন ?

আমার মন বলছে। ছোট মাকে দেখে, দিদিকে দেখে যেমন আপন মানুষ মনে হয়েছিল, আপনাকে দেখেও ঠিক তেমনি আপনজন মনে হয়েছে।

এবার আত্রেয়ী হেসে বললো. সত্যিই যদি আপনজন মনে হয় তাহলে আপনি আপনি করেন কেন ?

দেবাশীষ হেসে বললো, তুমি অনুমতি দিলেই আপনি বর্জন করব।

তুমি নিশ্চয়ই ছোট মা আর দিদিকে নিয়মিত চিঠি লেখো ?

হ্যাঁ লিখি।

আমার কথা লিখেছ ?

না।

কেন ?

ভেবেছি, ওরা আগ্রায় ফিরলেই বলব।

যদি আমার কথা শুনে ওরা রাগ করেন ?

দেবাশীষ মিষ্টি হাসি হেসে বললো, না আত্রেয়ী, ওরা আমার উপর রাগ করবেন না।

কেন ?

আমার উপর ওদের বিশ্বাস আছে। তাছাড়া ওরা সবাই আমাকে এত ভালবাসেন যে রাগ করবার প্রশ্নই ওঠে না।

ওদের তিনজনের মধ্যে কে তোমাকে সব চাইতে বেশী ভালবাসেন ?

দিদির কথা ছেড়ে দাও। ও তো আমার জন্য উন্মাদ।···

তাই নাকি ?

আমি যদি সাদাকে কালো বলি তাহলে দিদিও তাই বলবে।

আচ্ছা পাগল মেয়ে।

সত্যি পাগল মেয়ে। তাইতো দিদির জন্য মাঝে মাঝেই বড় চিন্তা হয়।

কেন ?

ও আমাকে এত ভালবাসে যে বোধহয় বিয়ের পর স্বামীকেও তেমন ভালবাসতে পারবে না।

আত্রেয়ী অবাক হয়ে অঞ্জুর কথা ভাবে।

দেবাশীষ আবার বলে, সেই ছোটবেলা থেকে ও আমাকে এমন আঁকড়ে ধরেছে যে আর কোন পুরুষকে ও ভালবাসার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

কিন্তু স্বামীর ভালবাসা ত আলাদা জিনিস।

একশ বার আলাদা কিন্তু এখনও ওর যা ছেলেমানুষি দেখি তাতে সত্যি চিন্তিত হই।

ও বুঝি এখনও খুব ছেলেমানুষি করে ?

এখনও এমন ছেলেমানুষি করে যে আমি ঘাবড়ে যাই।

যেমন ?

সেই চার-পাঁচ বছর বয়সে যেমন আমাকে জড়িয়ে শুতো, এখনও তেমনি আমাকে জড়িয়ে না শুলে ওর ঘুমই আসবে না।

দেবাশীষ একটু থেমে, বলে, অথচ দিদি ত এখন আর সেই কচি বাচ্চা নেই।

আত্রেয়ী একটু হেসে বলে, অত্যন্ত সরল।

শুধু সরল নয়, ও আমাকে অসম্ভব বিশ্বাস করে।

তোমাকে সবাই বিশ্বাস করে, সবাই ভালবাসে।

তুমিও ?

নিশ্চয়, একশ' বার।

আমি তা জানি।

তুমি নিজেও কী আমাকে কম বিশ্বাস করো ? কম ভালবাসো ? আত্রেয়ী একটু ভাবে। তারপর বলে, তুমি যে কেন আমাকে এত ভালবাসলে তা ভেবে পাই না।

তোমার মত সুন্দরী, শিক্ষিতা, সুগায়িকা মেয়ে যে কেন এই কেরানীর···

আঃ! কি যা তা বলছ ?

আমি কেরানী না ?

না। তুমি দেবাশীষ, তুমি ছোট মার ছেলে, তুমি অঞ্জুর দাদা বলেই তোমাকে ভালবাসি। শুধু একজন কেরানীকে ভালবাসব কোন দুঃখে ?

আগ্রা থেকে ফিরে যাবার দু'একদিন পরই আত্রেয়ী চিঠি লেখে —আগ্রার তাজমহল আর ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদে তোমার সান্নিধ্য উপভোগ করতে করতে আমি যেন মনে মনে সম্রাজ্ঞী হয়ে গেছি। এই ছোট্ট সংসারের গণ্ডীর মধ্যে আর নিজেকে খুশী রাখতে পারছি না। মনে মনে ভাবছি, আবার কবে সম্রাটের দেখা পাবো।

দেবাশীষ উত্তর দেয়—তুমি আমার মনের কথাই লিখেছ। এই

তাজমহলের চত্বরে আমি আমার মমতাজকে পেয়ে সত্যি আমি সম্রাট হয়েছি। বিশ্বাস কর, আমি তাজে গেলেই তোমার উপস্থিতি, তোমার সান্নিধ্য অনুভব করি।…

সম্রাট, তোমার দীর্ঘ চিঠিতে অনেক কথাই লিখেছ কিন্তু গানের কথা জানাও নি। ঠিক মত রেওয়াজ করছ তো? ওস্তাদজী অত্যন্ত গুণী লোক। উনি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তোমাকে নিয়ে ওর অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। ঐ বৃদ্ধ যেন দুঃখ না পান। তোমাকে ভাল গায়ক হতেই হবে। যে ইমন কল্যাণ শুনে তুমি তোমার মমতাজকে পেয়েছ, একদিন তোমাকে সেই ইমন কল্যাণ গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করতে হবে। তাছাড়া যখন আমি থাকব না, তখন তো এই গান গেয়েই তুমি আমাকে তোমার মধ্যে উপলব্ধি করবে। যতদিন তোমার কণ্ঠস্বর থাকবে, যতদিন তুমি ইমন কল্যাণ গাইবে, ততদিন তোমার মমতাজ বেঁচে থাকবে।…

মমতাজ, তোমাকে হারিয়ে আমি স্বামী হরিদাস বা তানসেনও হতে চাই না। যতদিন আমার মমতাজ বেঁচে থাকবে ততদিন তোমার সম্রাটও বেঁচে থাকবে। মমতাজকে হারাবার পর সম্রাটের অস্তিত্ব থাকে কী? যদি গানের ভিতর দিয়ে বাঁচতে চাও তাহলে তুমি তোমার সন্তানকে গান শিখও।….

জানো মমতাজ, কাল তুমি তোমার কলেজের মেয়েদের নিয়ে রওনা হবার পরও আমিও ক'দিনের জন্য বেরিয়ে পড়ব।

কোথায় যাবে?

কাল রাত্তিরে ছোট মাকে স্বপ্ন দেখেছি। তাই ভাবছি একবার ঘুরে আসি।

আত্রেয়ী হেসে বললো, তুমি নেহাতই শিশু।

কেন?

এত বড় হয়েছ কিন্তু এখনও প্রত্যেক মাসে ছোট মাকে না দেখলে থাকতে পারো না।

কি করবো বলো। ছোট মা এমন চিঠি লেখে যে না যেয়ে পারি না।

ছোট মা চিঠি না লিখলেও তুমি যাবে।

দেবাশীষ গম্ভীর হয়ে বলে, না যেয়ে উপায় কী? কাকুকে দিয়ে তো সংসারের কোন কাজ হয় না। আমি জানি আমি না গেলে ছোট মা মুশকিলে পড়বে। তাই বাধ্য হয়েই প্রত্যেক মাসে যেতে হয়। ও একটু থেমে আত্রেয়ীকে বলে, তুমি তো ছোট মার চিঠি পড়ো। বলো, ঐ চিঠি পাবার পর না গিয়ে থাকা যায়?

তা ঠিক। ছোটমার চিঠি পড়েই আমি বুঝতে পারি তোমাকে দেখার জন্য ওর মন ছটফট করে।

দিদি কি বলে জানো?

কি বলে?

বলে, তুমি না থাকলে মা কিছুতেই ভালমন্দ রান্না করবে না। সব সময় বলবে, ছেলেটা মেসে খাচ্ছে আর আমরা এখানে...

তুমি গেলে নিশ্চয়ই খুব ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়।

দারুণ। দেবাশীষ হাসে। বলে, কাকু তো ছোট মাকে বলে, সব সময় শুনি তোমার শরীর খারাপ। কাজকর্ম করতে কষ্ট হয় কিন্তু দেবু এলে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখি তা দেখে তো মনে হয় না তোমার শরীর খারাপ।

আত্রেয়ী হেসে জিজ্ঞাসা করে, ছোট মা কিছু বলেন না?

ছোট মা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, ছেলেটা দুদিনের জন্য এসেছে। আমার শরীর ভাল না বলে কি আমি ওকে না খাইয়ে রাখব?

আর তোমার দিদি কি বলে?

দিদি কদিন আগে কি লিখেছে জানো?

কী ?

লিখেছে, এ মাসে বাবা ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিয়েছেন বলে সংসারে বেশ টানাটানি কিন্তু এই টানাটানির মধ্যেও মা বেশ দামী উল কিনে তোমার একটা পুলওভার তৈরি করেছেন। শুনছি, মা দু'একদিনের মধ্যে তোমার বিছানার চাদর আর বেডকভার কিনতে যাবেন। যত টানাটানি আমার বেলায়।

আত্রেয়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, তোমার ভাগ্য দেখে আমার হিংসা হয়।

শুধু তুমি কেন, আমার সৌভাগ্য দেখে আমারই হিংসা হয়।

এবার আত্রেয়ী প্রশ্ন করে, তোমার বিছানার চাদর-টাদরও ছোট মা কিনে দেন ?

জামা-কাপড় বিছানাপত্তর সবকিছু।

কেন ?

এসব কেনার টাকা কোথায় পাবো ?

চাকরি করেও বলছ টাকা কোথায় পাবো ?

প্রত্যেক মাসে দু'শো টাকা বাবাকে পাঠাবার পর হাতে আর বিশেষ কিছু থাকে না।

শ' দেড়েক পাঠালে কি ওদের খুব কষ্ট হবে ?

বিন্দুমাত্র না কিন্তু ছোট মার হুকুম, বাবা-মাকে দু'শ পাঠাতেই হবে।

তোমার ছোট মার সত্যি তুলনা হয় না।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তুমি ছোট মাকে দেখলে শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে মাথা না নুইয়ে পারবে না।

আর তোমার কাকু ?

কাকু তো মহাদেব।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দেবাশীষ বললো, দিদি, তুই বিশ্বাস কর, আত্রেয়ীর মত মেয়ে হয় না। বোধহয় তোর মতই ও আমাকে ভালবাসে।

দিদি, তোর চাইতে কাউকে আমি ভালবাসি না। তোর চাইতে কাউকে বেশী ভালবাসতে আমি পারব না। কিন্তু তোর পরেই বোধহয় আত্রেয়ীকে ভালবেসেছি।

কেন তুমি আমাকে এত ভালবাস দাদা?

দেবাশীষ একটু হেসে বললো, তোকে ভালবেসেই তো সবাইকে ভালবাসতে শিখলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, দাদা, আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেবে না?

একশোবার। দেবাশীষ আবার একটু হেসে বললো, তোর কাছে পরীক্ষায় পাস না করলে তো আত্রেয়ীকে আমি পাব না।

না, না, দাদা, ওকথা বল না। যাকে তুমি অত ভালবাস, যে তোমাকে এত ভালবাসে, তাকে তুমি পাবেই।

কিন্তু যাকে তোর পছন্দ হবে না, তাকে আমি সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করতে পারি না।

তুমি কী পাগল হয়েছ দাদা?

না দিদি, পাগল হই নি। তুই আমাকে ভালবাসিস, আমি তোকে ভালবাসি বলেই তো তোর উপর নির্ভর করি।

কিন্তু তাই বলে আমার মতামতের উপর এত বিশ্বাস রাখা অন্যায়।

অন্যায় কেন হবে? তুই আমার মনের খবর, ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানিস না?

জানি বৈকি।

কোন মেয়ে আমার জীবনে এলে আমি সুখী হব, তা যদি তুই না বুঝিস, তাহলে আর কে বুঝবে?

অঞ্জলি কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

দেবাশীষও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা দিদি তোর জীবনে যখন এই রকম কোন ঘটনা ঘটবে, তখন কি তুই আমার পরামর্শ নিবি না?

নিশ্চয়ই নেব।

আমার মতামতের গুরুত্ব দিবি না?

অঞ্জলি দেবাশীষের কাঁধের উপর মাথা রেখে বললো, যদি কোনদিন কাউকে ভালবাসি, তখন শুধু তোমার আশীর্বাদ নিয়েই আমি তাঁকে বিয়ে করতে পারব।

আমার মত না নিয়ে বিয়ে করবি না?

না।

ঠিক বলছিস?

হ্যাঁ দাদা, তোমার মত না নিয়ে আমি কাউকে স্বেচ্ছায় ভালবেসে বিয়ে করব না।

যে দিদি আমাকে এত বিশ্বাস করে, তাকে আমি বিশ্বাস করব না?

অঞ্জলি দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বললো, দাদা তুমি আমাকে কেন এত ভালবাস?

দেবাশীষ হাসতে হাসতে ওর মাথায় হাত দিতে দিতে বললো, তুই যে আমার দিদি! তুই যে আমার স্বপ্ন। দেবাশীষ একটু থেমে বললো, এর পরের জন্মে আমি তোর ছেলে হয়ে জন্মাব।

দাদা!

॥ পাঁচ ॥

জানো, আত্রেয়ী কার নাম ছিল ?

দেবাশীষ বলে, এক ঋষি-কন্যার নাম।

আর কিছু ?

না, আর কিছু জানি না।

এবার আত্রেয়ী বলে, এই ঋষি-কন্যা মহাকবি বাল্মীকির শিষ্যা। এই মহাকবির কাছেই উনি বেদ-বেদাঙ্গ পাঠ করছিলেন কিন্তু এমন সময় সীতা তাঁর দুই পুত্রকে নিয়ে ওখানে হাজির। কবি লব-কুশের শিক্ষা দিতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে আত্রেয়ী সেখান থেকে মহামুনি অগস্ত্যের কাছে গিয়ে তাঁর শিষ্যা হলেন।

দেবাশীষ বললো, তবে আত্রেয়ী তো অত্যন্ত বিদুষী ছিলেন।

একটু হেসে আত্রেয়ী বললো, আমারও ব্যবস্থা ঐ ঋষি-কন্যার মত হয়েছে।

কেন ?

তোমার মত নতুন গুরুর কাছে এসেই তো আমার মুক্তি হলো।

তুমি ঠিক উল্টো কথা বললে।

না, না, ঠিকই বলছি।

তুমিই তো আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য।

আত্রেয়ী একটু হেসে বললো, ভারতবর্ষের মানুষ স্বামী হরিদাসকে ভুলে গেছে কিন্তু বৈজু, বাবা রামদাস, তানসেন বা পণ্ডিত দিবাকরের মত তাঁর শিষ্যদের ভোলে নি।

দেবাশীষ চুপ করে থাকে।

আত্রেয়ী আবার বলে, একদিন যখন আমি থাকব না, তখন এই রকম বাত্তিরে তোমার ইমন কল্যাণ শুনে...

সারা জীবনেও আমি তোমার মত ইমন কল্যাণ গাইতে পারব না।

আমার চাইতে অনেক ভাল গাইবে।

দেবাশীষ ওর একটা হাতের উপর আলতো করে নিজের একটা হাত রেখে বললো, তুমি আমাকে বড্ড বেশী ভালবাস।

খাঁটি সোনাকে সবাই আদর করে, ভালবাসে। আত্রেয়ী পাশ ফিরে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি খাঁটি সোনা বলেই তো ছোট মা, কাকু আর অঞ্জু তোমাকে এত ভালবাসেন।

দেবাশীষ হেসে বলে তোমার ধারণা, আমি একজন মহাপুরুষ।

আমি কখনই তোমাকে মহাপুরুষ ভাবি না, তুমি একটা মানুষ —সত্যিই তোমার মনুষ্যত্ব আছে।

তুমি যে দিদির মত কথা বলছ।

অঞ্জুও যে আমার মত তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, আমার মত সে-ও তোমাকে চিনেছে বলেই এসব কথা বলে।

আবার একটু চুপ করে থাকার পর দেবাশীষ বলে, আমি যখন পিছন ফিরে নিজের জীবনের দিকে তাকাই তখন অবাক হয়ে যাই।

কেন?

গরীব টিকিট কালেক্টরের ছেলে হয়েও কাকু আর ছোট মা-র জন্য আমি রাজপুত্রের মতো সুখে জীবন কাটাচ্ছি।

ভগবানের পরম আশীর্বাদ যে তুমি ওদের মত উদার, মহৎ মানুষের কাছে আসতে পেরেছ।

দেখ মমতাজ, আমার সঙ্গে ছোট মার বয়সের পার্থক্য মাত্র বছর পনেরো কিন্তু তবু উনি আমাকে ঠিক মায়ের মতই স্নেহ করেন।

মাতৃত্বের কোন বয়স নেই।

ঠিক বলেছ। ও একটু হেসে বলে, এখনও ছোট মা রোজ ভোরবেলায় আমার কাছে একটু না শুয়ে পারেন না।

আত্রেয়ী একটু হাসে।

দেবাশীষও হাসতে হাসতে বলে, দিদি কি বলে জান ?

কি ?

ও ছোট মাকে বলে, তুমি দাদাকে হাজার গুণ ভালবাস।

ছোট মা কিছু বলেন না ?

ছোট মা বলেন, বড়ছেলেকে সব মায়েরাই বেশী ভালবাসে।

দেবাশীষ আর আত্রেয়ীর কথা বলতে বলতে অঞ্জলির সুন্দর মুখখানা আরো সুন্দর, আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি আত্রেয়ীকে কী বলে ডাকতে ?

মমতাজমহল !

কেন ?

অঞ্জলি হেসে বললো, দাদা ওকে মমতাজ বলে ডাকত বলে আমি মমতাজমহল বলতাম। তাছাড়া ওকে দেখতে এত সুন্দর ছিল যে···

তোমার চাইতেও ?

আমি ওর একশো ভাগের এক ভাগ না।

বল কি ?

ঠিকই বলছি। অঞ্জলি একটু থেমে বললো, কিছু কিছু মেয়ে আছে যাদের যৌবন, দেহের সৌন্দর্যটাই বড় সম্পদ। সব চাইতে বেশী চোখে পড়ে। আর কিছু মেয়ে আছে যাদের শ্রী সব মানুষকে মুগ্ধ করে।

তা ঠিক।

মমতাজমহলের দেহের সৌন্দর্য ছাড়াও এমন একটা শ্রী ছিল যা সহজে চোখে পড়ে না।

তোমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল ?

দারুণ।

তোমাকে ও কি বলে ডাকত ?

কখনো দিদি, কখনো অঞ্জলি, কখনো আবার শত্রু···

শত্রু।

হ্যাঁ।

শত্রু বলত কেন ?

ও হাসতে হাসতে বললো, আমি দাদাকে খুব বেশী ভালবাসি বলে।

তোমার মা-বাবার সঙ্গে ওর পবিচয় ছিল ?

পরিচয় ছিল না মানে !

ওর সঙ্গে কে তোমার মা-বাবাব পবিচয় করিয়ে দেন ?

আমি।

কি বলে পরিচয় করালে ?

সে কি মজার ঘটনা।

অঞ্জলিব সঙ্গে ঘবে ঢুকেই আত্রেয়ী ওর মাকে প্রণাম করল।

মিসেস ব্যানার্জী ওর চিবুক ধরে বললেন, তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললো, আমি সব বলছি কিন্তু একটিও প্রশ্ন করতে পারবে না। যা বলব, চুপ করে শুনবে।

অত বকবক না করে যা বলবি বল।

এর নাম আত্রেয়ী। আমি ডাকি মমতাজমহল বলে।··

মমতাজমহল বলে কেন ?

মমতাজমহলের মত সুন্দরী বলে।

অঞ্জলির মা আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, ঠিক নামই দিয়েছিস।

এক নিশ্বাসে অঞ্জলি বললো, মমতাজমহলকে আমার দারুণ পছন্দ। আমি দাদার সঙ্গে এর বিয়ে দেব! যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহলে আমি, দাদা আর মমতাজমহল আলাদা বাড়িতে···

উঃ! বাবা! একটু কম বকবক কর। এবার উনি আত্রেয়ীকে একটু কাছে টেনে নিয়ে অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ছেলেকে দেখিয়েছিস? তার পছন্দ না হলে তো আমার-তোর পছন্দ হলে লাভ নেই।

আমি একটা শাঁকচুন্নী পেত্নীকে ধরে আনলেও দাদা তাকেই বিয়ে করবে।

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললো, সেদিন আমাদের বাড়িতে কি দারুণ আনন্দের বন্যা বয়ে গেল, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

তারপর আর কি? ও যখনই দু'একদিনের জন্য আগ্রা আসত তখনই আমাদের বাড়িতে উৎসব লেগে যেত আর মা-বাবা দুনিয়ার মানুষকে বলে বেড়াতেন—আত্রেয়ীর মত কল্যাণী, সুন্দরী, শ্রীমণ্ডিতা মেয়ে হয় না।

আমি চুপ করে ওর কথা শুনি।

ও আপন মনে বলে যায়, কোন কোনদিন রাত্রে আমাদের বাড়িতে গানের বৈঠক বসত। মমতাজমহল গাইত—

ধরম কর করম পুণ্য যোগ যোগ্যতা
জ্ঞান জপ তপ ধ্যান ঔর জ্ঞান।

উনি খুব ভাল গাইতেন, তাই না?

অপূর্ব ! ও একটু থেমে বলে, গান শুরু করেই মমতাজমহল দাদাকে তাল বলত—ধা ধা দেন তা কং তাগে দেন তা ৎেটে কতা গদি ঘেনে।

তোমার দাদা বুঝি তবলা বাজাতেন ?

হ্যাঁ।

গাইতেন না ?

শেষের দিকে দাদাও ওর সঙ্গে শুরু করত—

ঐসে কৃপানিধান তুজো নহি তুঅ সমান,
তেরোহি আশ দাস নবলকিশোর কো নহি আন।

হঠাৎ অঞ্জলি থামে। আর কিছু বলে না। আস্তে আস্তে ওর উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানায় বিষণ্নভাব ছোঁয়া লাগে। ম্লান হয় ওর দুটো চোখ। দেখতে দেখতে ছোট্ট কালো মেঘের টুকরোটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্ধকার গাঢ় হতে শুরু করে। আস্তে আস্তে সমস্ত আলোটুকু অন্ধকার গ্রাস করে। অঞ্জলির দুচোখ বেয়ে জল পড়ে।

আমি বোবা হয়ে বসে থাকি। কোন কথা বলি না। সাহস হয় না। মাঝে মাঝে চোরের মত ওর দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি গুটিয়ে নিই। বেদনায় মন ভরে যায়।

কতক্ষণ যে দুজনে এইভাবে চুপ করে বসেছিলাম তা মনে নেই। অনেকক্ষণ পরে আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতেই অঞ্জলি বললো, মুছিয়ে দিতে হবে না। আপনিই শুকিয়ে যাবে। এবার একটু ম্লান হেসে বললো, বাইরে থেকে আমাকে বা মা-বাবাকে দেখে কেউ বুঝতে পারে না, জানতে পারে না আমাদের মনের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলছে।

তোমার মমতাজমহলের কি হয়েছিল ?

অঞ্জলির মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে গেল। একটা চাপা

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, দাদা আর মমতাজমহল তাজে বেড়াচ্ছিল। তারপর ও দাদাকে অনেকগুলো গান শোনায়।

তারপর ?

তারপর দাদা যখন নিচে দাঁড়িয়ে একটা গার্ডের সঙ্গে গল্প করছিল তখন মমতাজমহল উপরে উঠে গেছে।

তাজমহলের উপরতলায় ?

হ্যাঁ।

তারপর ?

উপরতলা থেকে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে দাদার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে ওর শাড়ি উড়ে যেতেই সামলাতে না পেরে···

আমি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলাম, নিচে পড়ে যান ?

হ্যাঁ।

আবার আমরা দুজনে বোবা হয়ে গেলাম।

অনেকক্ষণ পরে অঞ্জলি বললো, তাজের গার্ডরা বলে এখনও ওরা মাঝে মাঝে রাত্তিরের দিকে তাজের আশপাশ থেকে মমতাজমহলের গান শুনতে পায়।

বল কী ?

ঠিকই বলছি। একবার আমিও ওর ইমন কল্যাণের একটু সুর শুনেই ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম।

একটু পরে হঠাৎ ও আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললো, দাদার কথা, মমতাজমহলের কথা মনে হলেই বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়। মনে হয়, বুকের হাড়গুলো বোধহয় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

তা তো হবেই।

একটু পরেই ও আমার কাঁধের উপর থেকে মাথা তুলে দুহাত

দিয়ে আমার মুখখানা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমি তো চাইনি কেউ আমাকে ভালবাসুক, আমিও কাউকে ভালবাসতে চাইনি, কিন্তু কেন তুমি আমাকে ভালবাসলে ? কেন, কেন আমি তোমাকে ভালবাসলাম।

আমি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সমস্ত আবেগ সংযত করার চেষ্টা করি কিন্তু না, পারি না। হেরে যাই। আমার দু'চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ে। অঞ্জলিকে আমি কোন সান্ত্বনা দিতে পারি না।

আমি তো তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। আমি দাদার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাঁর অনুমতি না নিয়ে কাউকে ভালবাসব না, কাউকে বিয়ে করব না।

না, না, তোমাকে বিয়ে করতে হবে না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে অঞ্জলি স্বাভাবিক হলে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের বাড়িতে তো কোনদিন তোমার দাদাকে দেখতে পাইনি ?

দাদা সব সময় ভিতরের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে আর মনে মনে গুনগুন করে ইমন কল্যাণ গায় অথবা তাল দেয়।

এমনি কোন পাগলামি করে না ?

কিচ্ছু না। দাদার এমনি কোনরকম পাগলামি নেই।

তোমাকে তো এখনও দারুণ ভালবাসে।

অঞ্জলি একটু ম্লান হাসি হেসে বললো, হ্যাঁ, আমাদের তিনজনকেই খুব ভালবাসে। তবে মা-র হাতে ছাড়া কারুর কাছে কিচ্ছু খায় না।

কেন ?

জানি না। তবে আমরা কেউ দাদাকে জোর করি নি।

তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ?

না। দাদা এমনি কোন কথাবার্তা বলেন না তবে বুঝতে পারে।

বুঝতে পারে মানে ?

বিশেষ করে আমার বা মা-র অসুখ-বিশুখ হলে দাদা আমাদের পাশে বসে বসে শুধু কাঁদে, কোন কথা বলে না।

আহা! মানুষটা উন্মাদ হয়েও ভালবাসা হারায় নি।

আমি অঞ্জলির পিছনে পিছনে ওদের ড্রইংরুমে পা দিয়েই অবাক। সামনেই ওর দাদা।

দিদি! এ লোকটা কি দেবাশীষ? এ কি মমতাজকে ভালবাসে? ওকে বলে দে, না, না ভালবেসো না! সব হারিয়ে যাবে। দেবাশীষবাবু অঞ্জলিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, দিদি, তুই ওকে বারণ কর ও যেন কাউকে ভাল না বাসে।

অঞ্জলি কাঁদছে। ডক্টর ব্যানার্জী আর তাঁর স্ত্রীও কাঁদছেন।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওদের দেখার পর আমার চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে গেল।